আদিম রিপু

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

তিন টাকা

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ—১৩৬২

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আদিম রিপু

এক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলা দেশে, বিশেষত কলিকাতা শহরে, মানুষের জীবনের মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তারপর জিন্না সাহেবের সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন আমরা মৃত্যু দেবতাকে একেবারে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। জাতি হিসাবে আমরা যে টিকিয়া আছি, সে কেবল মৃত্যুর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারি বলিয়াই। বাঘ ও সাপের সঙ্গে আমরা আবহমানকাল বাস করিতেছি, আমাদের মারে কে?

সম্মুখ সমরের প্রথম অনলোদ্‌গার প্রশমিত হইয়াছে; কিন্তু তলে তলে অঙ্গার জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে হঠাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া আবার ভস্মের অন্তরালে লুকাইতেছে। কলিকাতার সাধারণ জীবনযাত্রায় কিন্তু কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। রাস্তায় ট্রাম-বাস তেমনি চলিতেছে, মানুষের কর্মতৎপরতার বিরাম নাই। দুই সম্প্রদায়ের সীমান্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হৈ হৈ দুমদাম শব্দ ওঠে, চকিতে দোকানপাঠ বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তায় দুই চারিটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। সুরাবর্দি সাহেবের পুলিস আসিয়া হিন্দুদের শাসন করে, মৃতদেহের সংখ্যা দুই চারিটা বাড়িয়া যায়।

কোথা হইতে মোটর ভ্যান আসিয়া মৃতদেহগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া অন্তর্ধান করে। তারপর আবার নগরীর জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিতে থাকে।

ব্যোমকেশ ও আমি কলিকাতাতেই ছিলাম। আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসাটা যদিও ঠিক সমর সীমানার উপর পড়ে না, তবু যথাসাধ্য সাবধানে ছিলাম। ভাগ্যক্রমে কয়েক মাস আগে ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার খোকাকে ও সত্যবতীকে লইয়া পশ্চিম বেড়াইতে গিয়াছিল, তাই সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন ব্যোমকেশ 'তার' করিয়া তাহাদের কলিকাতায় ফিরিতে বারণ করিয়া দিল। তদবধি তাহারা পাটনায় আছে। ইতিমধ্যে সত্যবতীর প্রবল পত্রাঘাতে আমরা বার দুই পাটনা ঘুরিয়া আসিয়াছি; কারণ আমরা যে বাঁচিয়া আছি, তাহা মাঝে মাঝে স্বচক্ষে না দেখিয়া সত্যবতী বিশ্বাস করিতে চাহে নাই।

যাহোক, খোকা ও সত্যবতী নিরাপদে আছে, ইহাতেই আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় নিজের প্রাণ-রক্ষার চেয়ে প্রিয়জনের নিরাপত্তাই অধিক বাঞ্ছনীয় হইয়া ওঠে।

যেদিনের ঘটনা লইয়া এই কাহিনীর সূত্রপাত সেদিনটা ছিল দুর্গাপূজা এবং কালীপূজার মাঝামাঝি একটা দিন। দুর্গাপূজা অন্যান্য বারের মত যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে এবং কালীপূজাও যথাবিধি সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আমরা দুজনে সকালবেলা খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময় বাঁটুল সর্দার আসিল। তাহাকে সেলামী দিলাম। বাঁটুল এই এলাকার গুণ্ডার সর্দার; বেঁটে নিটোল চেহারা, তৈলাক্ত ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে বাঁটুলের প্রতাপ বাড়িয়াছে, পাড়ার সজ্জনদের গুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিবার ওজুহাতে সে সকলের নিকট সেলামী আদায় করে।

সেলামী না দিলে হয়তো কোনদিন বাঁটুলের হাতেই প্রাণটা যাইবে এই ভয়ে সকলেই সেলামী দিত।

সেলামীর জুলুম সত্ত্বেও ব্যোমকেশের সহিত বাঁটুলের বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। আদায়তসিল উপলক্ষে বাঁটুল আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে চা সিগারেট দিত, তাহার সহিত গল্প জমাইত; শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষের কূটনীতি সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাইত। বাঁটুল এই ফাঁকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসঙ্গ তুলিত। যুদ্ধের পর মার্কিন সৈনিকেরা অনেক আগ্নেয়াস্ত্র জলের দরে বিক্রি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, বাঁটুল সেই অস্ত্র কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে তাহা আমাদের বিক্রি করিবার চেষ্টা করিত। বলিত, 'একটা রাইফেল কিনে ঘরে রাখুন কর্তা। আমরা তো আর সব সময় সব দিকে নজর রাখতে পারি না। ডামাডোলের সময় হাতে হাতিয়ার থাকা ভাল।'

ব্যোমকেশ বলিত, 'না বাঁটুল, রাইফেল আমাদের দরকার নেই। অত বড় জিনিস লুকিয়ে রাখা যাবে না, কোন্ দিন পুলিস খবর পাবে আর হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে একটা পিস্তল কি রিভলবার যদি জোগাড় করতে পার—'

বাঁটুল বলিত, 'পিস্তল জোগাড় করাই শক্ত বাবু। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব—'

বাঁটুল মাসে একবার আসিত।

সেদিন যথারীতি সেলামী লইয়া বাঁটুল আমাদের অভয় প্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলে আমরা কিছুক্ষণ ম্রিয়মানভাবে সাময়িক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিলাম। এভাবে আর কতদিন চলিবে? মাথার উপর খাঁড়া ঝুলাইয়া কতকাল বসিয়া থাকা যায়? স্বাধীনতা হয়তো আসিতেছে, কিন্তু তাহা ভোগ করিবার জন্য

বাঁচিয়া থাকিব কি? সম্মুখ সমরে যদি বা প্রাণ বাঁচে, কাঁকর ও তেঁতুল বিচির গুঁড়া খাইয়া কত দিন বাঁচিব? ব্যোমকেশের হাতে কাজকর্ম কোনও কালেই বেশী থাকে না, এখন একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যেখানে প্রকাশ্য হত্যার পাইকারী কারবার চলিতেছে, সেখানে ব্যোমকেশের রহস্যভেদী বুদ্ধি কাহার কাজে লাগিবে?

আমি বলিলাম, 'ভারতীরে ছেড়ে ধর এইবার লক্ষ্মীর উপাসনা।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ রাত দুপুরে ছোরা বগলে নিয়ে বেরোও, যদি দু'চারটে কালা বাজারের মক্কেলকে সাবাড় করতে পার, তাহলে আর ভাবতে হবে না। যে সময়-কাল পড়েছে, বাঁটুল সর্দারই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কথাটা মন্দ বলোনি, যুগধর্মই ধর্ম। কিন্তু কি জানো, ও জিনিষটা রক্তে থাকা চাই। খুনই বল আর কালাবাজারই বল, পূর্বপুরুষদের রক্তের জোর না থাকলে হয় না। আমার বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার, স্কুলে অঙ্ক শেখাতেন আর বাড়িতে সাংখ্য পড়তেন। মা ছিলেন বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, নন্দগোপাল নিয়েই থাকতেন। সুতরাং ওসব আমার কর্ম নয়।'

ব্যোমকেশের বাল্য ইতিহাস আমার জানা ছিল। তাহার যখন সতেরো বছর বয়স, তখন তাহার পিতার যক্ষা হয়, মাতাও সেই রোগে মারা যান। আত্মীয়-স্বজন কেহ উঁকি মারেন নাই। তারপর ব্যোমকেশ জলপানির জোরে বিশ্ববিদ্যা সমুদ্র পার হইয়াছে, নিজের চেষ্টায় নূতন জীবন-পথ গড়িয়া তুলিয়াছে। আত্মীয়-স্বজন এখনও হয়তো আছেন, কিন্তু ব্যোমকেশ তাঁহাদের খোঁজ রাখে না।

কিছুক্ষণ বিমনাভাবে কাটিয়া গেল। আজ সত্যবতীর একখানা চিঠি আসিতে পারে, মনে মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

খট্‌ খট্‌ খট্‌ খট্‌ কড়া নড়িয়া উঠিল। আমি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিলাম।

ডাক পিওন নয়। তৎপরিবর্তে যিনি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, বেশবাস দেখিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকই বলিতে হয়। কিন্তু সে কী স্ত্রীলোক! পাঁচ হাত লম্বা, তদনুপাতে চওড়া, শালপ্রাংশু আকৃতি; পালিশ করা আবলুশ কাঠের মত গায়ের রঙ; ঘটোধ্নী নিবিড় নিতম্বিনী, স্পষ্ট একজোড়া গোঁফ আছে; বয়স পঞ্চাশের ওপারে। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন; মনে হইল হারমোনিয়মের ঢাকনা খুলিয়া গেল।

তিনি রামায়ণ মহাভারত হইতে বিনির্গতা কোনও অতি-মানবী কিনা ভাবিতেছি, হারমোনিয়ম হইতে খাদের গভীর আওয়াজ বাহির হইল, 'আপনি কি ব্যোমকেশবাবু?'

আমি দ্রুত মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলাম। ব্যোমকেশের সহিত মহিলাটির কি প্রয়োজন জানি না, কিন্তু আমি যে ব্যোমকেশ নই, তাহা অকপটে ব্যক্ত করাই সমীচীন। ব্যোমকেশ ঘরের ভিতর হইতে মহিলাটিকে দেখিতে পায় নাই, আমার অবস্থা দেখিয়া উঠিয়া আসিল। সেও অভ্যাগতকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য থত-মত খাইয়া গেল, তারপর সৎসাহস দেখাইয়া বলিল, 'আমি ব্যোমকেশ।'

মহিলাটি আবার হারমোনিয়মের ঢাক্‌না খুলিলেন, বলিলেন, 'নমস্কার। আমার নাম মিস ননীবালা রায়। আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।'

'আসুন।'

খট খট্‌ জুতার শব্দ করিয়া মিস ননীবালা রায় ঘরে প্রবেশ

করিলেন ; ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ারে বসাইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরূপ আকৃতি লইয়া ইনি কখনই ঘরের ঘরণী হইতে পারেন না, স্বামীপুত্র ঘরকন্না গৃহস্থালী ইঁহার জন্য নয়। বিশেষ নামের অগ্রে 'মিস্' খেতাবটি দাম্পত্য সৌভাগ্যের বিপরীত সাক্ষ্য দিতেছে। তবে ইনি কি ? জেনানা ফাটকের জমাদারণী ? উহুঁ অতটা নয়। শিক্ষয়িত্রী ? বোধ হয় না। লেডি ডাক্তার ? হইতেও পারে—

পরক্ষণেই ননীবালা নিজের পরিচয় দিলেন। দেখিলাম বেশী ভুল করি নাই। তিনি বলিলেন, 'আমি পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধাত্রী ছিলাম, এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছি। একজনের কাছে আপনার নাম শুনলাম ঠিকানাও পেলাম। তাই এসেছি।'

ব্যোমকেশ গম্ভীরমুখে বলিল, কি দরকার বলুন।'

মিস ননীবালার চেহারা যেরূপ জবরদস্ত, আচার আচরণ কিন্তু সেরূপ নয়। তাঁহার হাতে একটা কালো রঙের হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল, তিনি সেটা খুলিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আমি গরীব মানুষ, ব্যোমকেশবাবু, টাকাকড়ি বেশী আপনাকে দিতে পারব না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'টাকাকড়ির কথা পরে হবে। কি দরকার আগে বলুন।'

ননীবালা ব্যাগ বন্ধ করিলেন, তারপর সহসা কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমার ছেলের বড় বিপদ, তাকে আপনি রক্ষে করুন ব্যোমকেশবাবু—।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনার—ছেলে!'

ননীবালা একটু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন, 'আমার ছেলে—

মানে—আমি মানুষ করেছি। অনাদিবাবু তাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছেন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বড় প্যাঁচালো ব্যাপার দেখছি। আপনি গোড়া থেকে সব কথা বলুন।'

ননীবালা তখন নিজের কাহিনী বলিতে আরম্ভ কবিলেন। তাঁহার গল্প বলার শৈলী ভাল নয়, কখনও দশ বছর পিছাইয়া কখনও বিশ বছর আগাইয়া বহু অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া যাহা বলিলেন, তাহাব জট ছাড়াইলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বাইশ তেইশ বছর আগে মিস ননীবালা রায় পাটনা হাসপাতালের ধাত্রী ছিলেন। একদিন একটি যুবতী হাসপাতালে ভর্তি হইল; অবস্থা খুবই খারাপ প্লুরিসির সহিত নানা উপসর্গ; তার উপব পূর্ণগর্ভা। যে পুরুষটি তাহাকে আনিয়াছিল, সে ভর্তি করিয়া দিয়াই অদৃশ্য হইল।

যুবতী হিন্দু নয়, বোধ হয় আদিম জাতীয় দেশী খৃষ্টান। দুই দিন পরে সে একটি পুত্র প্রসব করিয়া মাবা গেল। পুরুষটা সেই যে উধাও হইয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিল না।

এইরূপ অবস্থায় শিশুর লালন-পালনেব ব্যবস্থা রাজ সরকার করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ননীবালা শিশুটির ভার লইলেন। ননীবালা অবিবাহিতা, সন্তানাদি নাই, শিশুটি বড় হইয়া তাঁহার পুত্রের স্থান অধিকার করিবে এই আশায় তিনি শিশুকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। শিশুর নাম হইল প্রভাত রায়।

প্রভাতের বয়স যখন তিন-চার, তখন ননীবালা হঠাৎ একটি ইন্সিওর চিঠি পাইলেন। চিঠিব সঙ্গে দুই শত টাকার নোট। চিঠিতে লেখা আছে, আমি জানিতে পারিয়াছি আমার ছেলে তোমার কাছে আছে। তাহাকে পালন করিও। উপস্থিত

কিছু টাকা পাঠাইলাম, সুবিধা হইলে আরও পাঠাইব।—চিঠিতে নাম দস্তখৎ নাই।

তারপর প্রভাতের বাপের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লোকটা সম্ভবত মরিয়া গিয়াছিল। ননীবালা বিশেষ দুঃখিত হইলেন না। বাপ কোনও দিন আসিয়া ছেলেকে লইয়া যাইবে এ আশঙ্কা তাঁহার ছিল। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রভাত বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। ননীবালা নিজের ডিউটি লইয়া থাকেন, ছেলের দেখাশুনা ভাল করিতে পারেন না; প্রভাত পাড়ার হিন্দুস্থানী ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় খেলা করিয়া বেড়ায়। তাহার লেখাপড়া হইল না।

পাড়ায় এক মুসলমান দপ্তরীর দোকান ছিল। প্রভাতের যখন ষোল-সতরো বছর বয়স, তখন সে দপ্তরীর দোকানে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। প্রভাত লেখাপড়া শেখে নাই বটে, কিন্তু সে বয়াটে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গেল না। মন দিয়া নিজের কাজ করিত, ধাত্রীমাতাকে গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

এইভাবে তিন চার বছর কাটিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে অনাদি হালদার নামে এক ভদ্রলোক পাটনায় আসিলেন। অনাদিবাবু ধনী ব্যবসাদার। তাঁহার ব্যবসায়ের বহু খাতা বহি বাঁধাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তিনি দপ্তরীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দপ্তরী প্রভাতকে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিল। অনেক খাতা পত্র দপ্তরীর দোকানে সব বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক নয়। প্রভাত নিজের যন্ত্রপাতি লইয়া অনাদিবাবুর বাসায় আসিল এবং কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার খাতা বহির মলাট বাঁধিয়া দিল।

অনাদিবাবু অকৃতদার ছিলেন। প্রভাতকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগিয়া গিয়াছিল, তিনি একদিন ননীবালার বাসায়

আসিয়া প্রস্তাব করিলেন তিনি প্রভাতকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে চান।

এতবড় ধনী ব্যক্তির পোষ্যপুত্র হওয়া ভাগ্যের কথা; কিন্তু ননীবালা এক কথায় প্রভাতকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। প্রভাতও মাকে ছাড়িতে চাহিল না। তখন রফা হইল, প্রভাতের সঙ্গে ননীবালাও অনাদিবাবুর সংসারে থাকিবেন, নারীবর্জিত সংসারে ননীবালাই সংসার পরিচালনা করিবেন।

ননীবালা হাসপাতালের চাকরি হইতে অবসর লইলেন। অনাদি-হালদারও কর্মজীবন হইতে প্রায় অবসর লইয়াছিলেন, তিনজনে কলিকাতায় আসিলেন। সে আজ প্রায় দেড় বছর আগেকার কথা। সেই অবধি তাঁহারা বহুবাজারের একটি ভাড়াটে বাড়ির দ্বিতলে বাস করিতেছেন। যুদ্ধের বাজারে ভাল বাসা পাওয়া যায় না। কিন্তু অনাদিবাবু তাঁহার বাসার পাশেই একটি পুরাতন বাড়ি কিনিয়াছেন এবং তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ি তৈরী করাইতেছেন। বাড়ি তৈরি হইলেই তাঁহারা নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাইবেন।

অনাদিবাবুর এক বড় ভাই ছিলেন, তিনি কলিকাতায় সাবেক বাড়িতে বাস করিতেন। ভায়ের সহিত অনাদিবাবুর সদ্ভাব ছিল না, কোনও সম্পর্কই ছিল না। ভাই প্রায় দশ বছর পূর্বে মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুই পুত্র আছে—নিমাই ও নিতাই। অনাদিবাবু কলিকাতায় আসিয়া বাসা লইলে তাহারা কোথা হইতে সন্ধান পাইল এবং তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করিল।

ননীবালার মতে নিমাই ও নিতাই পাকা শয়তান, মিটমিটে ডান, ছেলে খাওয়ার রাক্ষস। কাকা পোষ্যপুত্র লইলে কাকার অতুল সম্পত্তি বেহাত হইয়া যাইবে, তাই তাহারা কাকাকে বশ করিয়া দত্তক গ্রহণ নাকচ করাইতে চায়। অনাদিবাবু ভ্রাতুষ্পুত্রদের মতলব বুঝিয়া কিছুদিন আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে

তিনি উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। মাস কয়েক আগে তিনি ভাইপোদের বলিয়া দিলেন তাহারা যেন তাঁহার গৃহে পদার্পণ না করে।

নিমাই ও নিতাই কাকার বাসায় আসা বন্ধ করিল বটে, কিন্তু আশা ছাড়িল না। অনাদিবাবু প্রভাতকে একটি বইয়ের দোকান করিয়া দিয়াছিলেন; কলেজ স্ট্রীটের এক কোণে ছোট্ট একটি দোকান। প্রভাত লেখাপড়া শেখে নাই বটে, কিন্তু সে বই ভালবাসে; এই দোকানটি তাহার প্রাণ। সে প্রত্যহ দোকানে যায়, নিজের হাতে বই বিক্রি করে। নিতাই ও নিমাই তাহার দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। বই কিনিত না, কেবল চক্ষু মেলিয়া প্রভাতের পানে চাহিয়া থাকিত; তারপর নীরবে দোকান হইতে বাহির হইয়া যাইত।

তাহাদের চোখের দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টির মত ভয়ানক। তাহারা মুখে কিছু বলিত না. কিন্তু তাহাদের মনের অভিপ্রায় প্রভাতের জানিতে বাকী থাকিত না। প্রভাত ভালমানুষ ছেলে, সে ভয় পাইয়া ননীবালাকে আসিয়া বলিল; ননীবালা অনাদিবাবুকে বলিলেন। অনাদিবাবু এক গুর্খা নিয়োগ করিলেন, যতক্ষন দোকান খোলা থাকিবে, ততক্ষণ গুর্খা কুকরি লইয়া দোকান পাহারা দিবে।

ভ্রাতুষ্পুত্র যুগলের দোকানে আসা বন্ধ হইল। কিন্তু তবু প্রভাত ও ননীবালার ভয় দূর হইল না। সর্বদাই যেন দুজোড়া অদৃশ্য চক্ষু তাঁহাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, তাঁহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিতেছে।

তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার লইয়া বাড়িতে অশান্তি দেখা দিয়াছে। একটি মেয়েকে দেখিয়া প্রভাতের ভাল লাগিয়াছিল; মেয়েটি পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু একটি পরিবারের মেয়ে, খুব ভাল গান বাজনা জানে, দেখিতে সুন্দরী। কোন এক সভায় প্রভাত

মেয়েটিকে গান গাহিতে শুনিয়াছিল এবং তাহার কথা ননীবালাকে বলিয়াছিল। অনাদিবাবু প্রভাতের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছিলেন, ননীবালার মুখে এই মেয়েটীর কথা শুনিয়া বলিলেন, তিনি নিজে মেয়ে দেখিয়া আসিবেন এবং পছন্দ হইলে বিবাহ দিবেন।

অনাদিবাবু মেয়ে দেখিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, এমেয়ের সঙ্গে প্রভাতের বিবাহ হইতে পারে না। তিনি কোনও কারণ প্রদর্শন করিলেন না, কিন্তু ননীবালার বিশ্বাস এ ব্যাপারে নিমাই ও নিতাইয়ের হাত আছে। সে যাই হোক, ইহার পর হইতে ভিতরে ভিতরে যেন একটা নূতন গণ্ডগোল শুরু হইয়াছে। ননীবালা ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। বর্তমান ডামাডোলের সময় প্রভাতের যদি কোনও দুর্ঘটনা হয়? যদি গুণ্ডা ছুরি মারে? নিমাই ও নিতাইয়ের অসাধ্য কাজ নাই। এখন ব্যোমকেশবাবু কোনও প্রকারে প্রভাতের জীবনরক্ষা করুন।

দুই

ব্যোমকেশ চোখ বুজিয়া ননীবালার অসংবদ্ধ বাক্যবহুল উপাখ্যান শুনিতেছিল, উপাখ্যান শেষ হইলে চোখ মেলিল। বিরক্তি চাপিয়া যথাসম্ভব শিষ্টভাবে বলিল,—'মিস্ রায়, এ ধরনের ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? আপনার সন্দেহ যদি সত্যিও হয়, আমি তো আপনার ছেলের পেছনে সশস্ত্র প্রহরীব মত ঘুরে বেড়াতে পারি না। আমার মনে হয় এ অবস্থায় পুলিসের কাছে যাওয়াই ভালো।

ননীবালা বলিলেন, 'পুলিসের কথা অনাদিবাবুকে বলেছিলুম, তিনি ভীষণ রেগে উঠলেন; বললেন—এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই, তোমাদের যদি এতই প্রাণের ভয় হয়ে থাকে পাটনায় ফিরে যাও।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আর কি করা যেতে পারে আপনিই বলুন।'

ননীবালাব স্বর কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল, 'আমি কি বলব ব্যোমকেশবাবু, আপনি একটা উপায় করুন। প্রভাত ছাড়া আমার আর কেউ নেই—আমি অবলা স্ত্রীলোক—' বলিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন।

ননীবালার চেহারা দেখিয়া যদিও কেহই তাঁহাকে অবলা বলিয়া সন্দেহ করিবে না, তবু তাঁহার হৃদয়টি যে অসহায়া রমণীর হৃদয় তাহা স্বীকার করিতে হয়। পালিত পুত্রকে তিনি গর্ভের সন্তানের মতই ভালবাসেন এবং তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতি মাত্রায় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হয়তো অমূলক, কিন্তু তবু তাহা উপেক্ষা করা যায় না।

কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে ননীবালার অশ্রু-বিসর্জন নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিল—'ভাইপো দুটো থাকে কোথায় ?'

ননীবালা আঁচল হইতে আশান্বিত চোখ বাহির করিলেন, তারা নেবুতলায় থাকে। আপনি কি— ?'

'ঠিকানা কি ? কত নম্বর ?'

'তা তো আমি জানি না, প্রভাত জানে। আপনি কি তাদের কাছে যাবেন ব্যোমকেশবাবু ? যদি আপনি ওদের খুব করে ধম্‌কে দেন তাহলে ওরা ভয় পাবে—'

'আমি তাদের ধম্‌কাতে গেলে তারাই হয়তো উল্‌টে আমাকে ধম্‌কে দেবে। আমি তাদের একবার দেখব। দেখলে আন্দাজ করতে পারব তাদের মনে কিছু আছে কিনা। তাদের ঠিকানা প্রভাত জানে ?' প্রভাতের ঠিকানা, অর্থাৎ আপনাদের বাড়ির ঠিকানা কি ?

'বাড়ির নম্বর ১৭২।২, বৌবাজার স্ট্রীট। কিন্তু সেখানে—বাড়িতে আপনি না গেলেই ভাল হয়। অনাদিবাবু—'

'অনাদিবাবু পছন্দ না করতে পারেন। বেশ, তাহলে প্রভাতের দোকানের ঠিকানা বলুন।'

'প্রভাতের দোকান—ঠিকানা জানি না—কিন্তু নাম জীবন-প্রভাত। ওই যে গোলদীঘির কাছে, দোরের ওপর মস্ত সাইন বোর্ড টাঙানো আছে—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্লান্ত শুষ্ক স্বরে বলিল, 'বুঝেছি। আপনি এখন আসুন তাহলে। যদি কিছু খবর থাকে জানতে পারবেন।'

ননীবালা বোধ করি একটু ক্ষুণ্ন হইয়াই প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ একবার কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্র রূপিনী।'

সেদিন সায়ংকালে ব্যোমকেশ একটি শারদীয়া পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, হঠাৎ পত্রিকা ফেলিয়া বলিল, 'চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে আমরা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাহির হওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম, নেহাৎ দায়ে না ঠেকিলে বাহির হইতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় বেড়াতে যাবে?'

সে বলিল, 'জীবন-প্রভাতের সন্ধানে।'

দুটি মোটা লাঠি জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলাম, হাতে লইয়া দুজনে বাহির হইলাম। ননীবালার উপর ব্যোমকেশের মন যতই অপ্রসন্ন হোক তাঁহার কাহিনী ভিতরে ভিতরে তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে।

গোলদীঘি আমাদের বাসা হইতে বেশী দূর নয়, সেখানে পৌঁছিয়া ফুটপাথের উপর এক পাক দিতেই মস্ত সাইনবোর্ড চোখে পড়িল। দোকানটি কিন্তু সাইনবোর্ডের অনুপাতে ছোটই বলিতে হইবে, সাইনবোর্ডের তলায় প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারে একটি ঘর, তাহার পিছনে একটি কুঠুরি। সদরে দ্বারের পাশে বেঁটে এবং বঙ্কিমচক্ষু গুর্খা দণ্ডায়মান।

দোকানে প্রবেশ করিলাম; গুর্খা একবার তির্যক নেত্রপাত করিল, কিছু বলিল না। দেখিলাম ঘরের দেয়ালগুলি কড়িকাঠ পর্যন্ত বই দিয়া ঠাসা; তাহাতে ঘরের আয়তন আরও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। তাকের উপর একই বই দশবারোটা করিয়া পাশাপাশি সাজানো। বিভিন্ন প্রকাশকের বই, নিজের প্রকাশন বোধ হয় কিছু নাই। আমার বইও দুই তিনখানা রহিয়াছে।

কিন্তু দোকানদারকে ঘরে দেখিতে পাইলাম না, কাউণ্টারে কেহ নাই।

কাউণ্টারের পিছনে কুঠুরির দরজা ঈষৎ ফাঁক হইয়া আছে। ফাঁক দিয়া যতটুকু দেখা যায় দেখিলাম তাহার মধ্যে একটি ছোট তক্তাপোষ পাতা রহিয়াছে এবং তক্তাপোষের উপর বসিয়া একটি যুবক হেঁটমুখে বইয়ের মলাট বাঁধিতেছে। মাথার উপর আবরণহীন বৈদ্যুতিক বালব, চারিদিকে কাগজ পিজবোর্ড লেইয়ের মালসা কাগজ কাটিবার ভীষণ দর্শন ছোরা প্রভৃতি ছড়ানো। তাহার মধ্যে বসিয়া যুবক তন্ময়চিত্তে মলাট বাঁধিতেছে।

ব্যোমকেশ একটু জোরে গলা খাঁকারি দিল। যুবক ঘাড় তুলিল, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় আঙুলের লেই মুছিতে মুছিতে আসিয়া কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়াইল; কোনও প্রশ্ন করিল না, জিজ্ঞাসু নেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল।

এইবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। বাঙলা দেশের শত সহস্র সাধারণ যুবক হইতে তাহার চেহারায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দেহের দৈর্ঘ্য আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট, গায়ের রঙ তামাটে ময়লা; মুখ ও দেহের কাঠামো একটু শীর্ণ। ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখা এখনও পুষ্ট হয় নাই; দাঁতগুলি দেখিতে ভাল কিন্তু তাহাদের গঠন যেন একটু বন্য ধরনের, হয়তো আদিম মাতৃরক্তের নিদর্শন। চোখের দৃষ্টিতে সামান্য একটু অন্যমনস্কতার আভাস, কিন্তু ইহা মনের অভিব্যক্তি নয়, চোখের একটা বিশেষ গঠনভঙ্গী। মাথার চুল ঈষৎ রুক্ষ ও ঝাঁকড়া, চুলের যত্ন নাই। পরিধানে গলার বোতাম-খোলা ঢিলা আস্তিনের পাঞ্জাবী। সব মিলিয়া যে চিত্রটি তৈয়ারী হইয়াছে তাহা নিতান্ত মামুলী এবং বিশেষত্বহীন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি জীবন-প্রভাতের মালিক প্রভাত কুমার রায়?'

যুবক বলিল, 'আমার নাম প্রভাত হালদার।'

'ও—হ্যাঁ—ঠিক কথা। আপনি যখন অনাদিবাবুর—' ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিল।

'পুষ্যিপুত্তুর।' প্রভাত নির্লিপ্তকণ্ঠে ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা পূরণ করিয়া দিল, তারপর ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

প্রভাত এতক্ষণে একটু সজীব হইয়া ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিল, তারপর আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

'আপনি তাহলে অজিতবাবু?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবিয়া প্রভাত আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রম আগ্রহে বলিল, নমস্কার। আমি আপনার কাছে একবার যাব।'

'আমার কাছে!'

'হ্যাঁ। আমার একটু দরকার আছে। আপনার ঠিকানা—?'

ঠিকানা দিয়া বলিলাম,—আসবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কী দরকার থাকতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।'

'সে কথা তখন বলব।—তা এখন কি চাই বলুন। আমার কাছে নতুন বই ছাড়াও ভালো ভালো পুরোনো বই আছে; পুরোনো বই বাঁধিয়ে বিক্রি করি। সে সব বই অন্য দোকানে পাবেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—আপাতত আপনার কাছে নিমাই আর নিতাইয়ের ঠিকানা নিতে এসেছি।'

প্রভাত ব্যোমকেশের দিকে ফিরিল, কয়েকবার চক্ষু মিটিমিটি করিয়া যেন এই নূতন প্রসঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল; তারপর

বলিল—'নিমাই নিতাইয়ের ঠিকানা ? তারা থাকে—' প্রভাত ঠিকানা দিল, মধু বড়াল লেনের একটা নম্বর। কিন্তু আমরা কেন নিতাই ও নিমাইয়ের ঠিকানা চাই সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করিল না।

'ধন্যবাদ।'

'আসুন। আমি কিন্তু একদিন যাব।'

'আসবেন।'

দোকান হইতে বাহির হইলাম। তখনও বেশ বেলা আছে; শীতের সন্ধ্যা নারিকেল ছোবড়ার আগুনের মত ধীরে ধীরে জ্বলে, সহজে নেভে না। ব্যোমকেশ বলিল—'চল, নিমাই নিতাইকে দেখে যাই। কাছেই তো।' কিছুক্ষণ চলিবার পর বলিল—'প্রভাত নিজেই বই বাঁধে, পুরানো বিদ্যে ছাড়তে পারেনি। ছেলেটা কেমন যেন মেদামারা—কিছুতেই চাড় নেই।'

বললাম—'আমার সঙ্গে কী দরকার কে জানে?'

ব্যোমকেশ চোখ বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল, বলিল—'তা এখনও বোঝোনি? তোমার বই ছাপতে চায়। বোধ হয় প্রোথিতযশা কোন লেখক ওকে বই দেননি। এখন তুমি ভরসা।'

বলিলাম—'প্রোথিতযশা নয়—প্রথিতযশা।'

সে মুখ টিপিয়া হাসিল; বুঝিলাম ভুলটা ইচ্ছাকৃত। বলিলাম—'যাহোক তবু ওর বই ছাপার দিকে ঝোঁক আছে। লেখাপড়া না জানলেও সাহিত্যের কদর বোঝে। সেটা কম কথা নয়।'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া রহিল, তারপর যেন বিমনা-ভাবে বলিল—'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী, খাসা তোর চ্যাঁচানি।'

আজকাল ব্যোমকেশ আচম্কা এমন অসংলগ্ন কথা বলে, যে তাহার কোনও মানে হয় না।

মধু বড়ালের গলিতে উপস্থিত হইলাম। গলিটি আজিকার নয়, বোধ করি জব চার্নকের সমসাময়িক। দু' পাশের বাড়িগুলি ইষ্টক-দন্তুর, পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়া কোনও ক্রমে খাড়া আছে।

একটি বাড়ির দরজার মাথায় নম্বর দেখিয়া বুঝিলাম এই বাড়ি। জীর্ণ বটে কিন্তু বাঁধানো-দাঁত চুলে-কলপ দেওয়া বৃদ্ধের মত বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা আছে। সদর দরজা একটু ফাঁক হইয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া সরু গলির মত একটা স্থান দেখা গেল। লোকজন কেহ নাই।

আমাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া ব্যোমকেশ ভিতরে প্রবেশ করিল। সুড়ঙ্গের মত পথটি যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে ডান দিকে একটি ঘরের দরজা। আমরা দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

আবছায়া একটি ঘর। তাহাতে অসংখ্য আসবাব ঠাসা; আলমারি টেবিল চেয়ার সোফা তক্তপোশ, নড়িবার ঠাঁই নাই। সমস্ত আসবাব পুরানো, একটিরও বয়স পঞ্চাশের কম নয়; দেখিলে মনে হয় ঘরটি পুরাতন আসবাবের গুদাম। তাহার মাঝখানে রঙ-চটা জাজিম-পাতা তক্তপোশের উপর বসিয়া দুইটি মানুষ বন্দুক পরিষ্কার করিতেছে। দু'নলা ছর্‌রা-বন্দুক, কুঁদার গায়ে নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র আঁকা দেখিয়া মনে হয় বন্দুকটিও সাবেক আমলের। একজন তাহার যন্ত্রে তেল লাগাইতেছে, অন্য ব্যক্তি নলের ভিতর গজ চালাইয়া পরিষ্কার করিতেছে।

মানুষ দুটির চেহারা এক রকম, বয়স একরকম, ভাবভঙ্গী একরকম; একজনের বর্ণনা করিলে দুজনের বর্ণনা করা হইয়া

যায়। বয়স ত্রিশের আশে পাশে, দোহারা ভারী গড়নের নাড়ু-গোপাল চেহারা, মেটে মেটে রঙ, চোখের চারিপাশে চর্বির বেষ্টনী মুখে একটা মোঙ্গলীয় ভাব আনিয়া দিয়াছে, মাথার চুল ছোট এবং সমান করিয়া ছাঁটা। পরিধানে লুঙ্গি ও ফতুয়া। তফাৎ যে একেবারে নাই তা নয়, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। ইহারাই যে নিমাই নিতাই তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আমরা দ্বার পর্যন্ত পৌছিতেই তাহারা একসঙ্গে চোখ তুলিয়া চাহিল। দুই জোড়া ভয়ঙ্কর চোখের দৃষ্টি আমাদের যেন ধাক্কা দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। তারপর যুগপৎ প্রশ্ন হইল,—'কি চাই ?'

কড়া স্বর, শিষ্টতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। আমি অসহায়ভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিলাম। ব্যোমকেশ সহজ সৌজন্যের সহিত বলিল—'এটা কি অনাদি হালদারের বাড়ি ?'

ক্ষণকালের জন্য দুই ভাই যেন বিমূঢ় হইয়া গেল। পরস্পরের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—'না।'

ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করিল—'অনাদিবাবু এখানে থাকেন না ?'

কড়া উত্তর—'না।'

ব্যোমকেশ যেন লজ্জিত হইয়া বলিল—'দেখছি ভুল ঠিকানা পেয়েছি। এ বাড়িতে কি অনাদিবাবুর কোনও আত্মীয় থাকেন ? আপনারা কি—?'

দুই ভাই আবার দৃষ্টি বিনিময় করিল। একজন বলিল—'সে খবরে কী দরকার ?'

'দরকার এই যে, আপনারা যদি তাঁর আত্মীয় হন তাহলে তাঁর ঠিকানা দিতে পারবেন।'

উত্তর হইল—'এখানে কিছু হবে না। যেতে পারেন।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর একটু বাঁকা সুরে বলিল—'আপনাদের বন্দুক আছে দেখছি। আশা করি লাইসেন্স আছে।'

আমরা ফিরিয়া চলিলাম। দুই ভ্রাতার নির্ণিমেষ দৃষ্টি আমাদের অনুসরণ করিল।

বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম,—'কি অসভ্য লোক দুটো।'

বাসার দিকে ফিরিয়া চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল,—'অসভ্য নয়, সাবধানী। এখানে এক জাতের লোক আছে তারা কলকাতার পুরানো বাসিন্দা; আগে বড় মানুষ ছিল এখন অবস্থা পড়ে গেছে; নিজেদের উপার্জনের ক্ষমতা নেই, পূর্ব পুরুষেরা যা রেখে গিয়েছিল তাই আঁক্‌ড়ে বেঁচে আছে। পচা বাড়ি ভাঙা আসবাব ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে সাবেক চাল বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। তাদের সাবধানতার অন্ত নেই; বাইরের লোকের সঙ্গে মেশে না, পাছে ছেঁড়া কাঁথাখানি কেউ ফাঁকি দিয়ে নেয়! দু' চারটি সাবেক বন্ধু ও আত্মীয় ছাড়া কারুর সঙ্গে ওরা সম্পর্ক রাখে না; কেউ যদি যেচে আলাপ করতে যায় তাকে সন্দেহ করে, ভাবে বুঝি কোনও কু-মৎলব আছে। তাই অপরিচিত লোকের প্রতি ওদের ব্যবহার স্বভাবতই রূঢ়। ওরা এক সঙ্গে ভীরু এবং কটুভাষী, লোভী এবং সংযমী। ওরা অদ্ভুত জীব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ দুটি ভাইকে কেমন দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল—'ননীবালা দেবী মিথ্যা বলেন নি। এক জোড়া বেড়াল; তবে শুকনো বেড়াল নয়, ভিজে বেড়াল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'ওদের দ্বারা প্রভাতের অনিষ্ট হতে পারে তোমার মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল—'ঘরের বেড়াল বনে গেলে বন-বেড়াল হয়। স্বার্থে ঘা লাগলে ওরাও নিজ মূর্তি ধারণ করতে পারে।'

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিতেছে, রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। আমরা দ্রুত বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

তিন

পরদিন সকালবেলা ব্যোমকেশ সংবাদপত্র পাঠ শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইল, তারপর বলিল—"নেই কাজ তো খৈ ভাজ। চল অনাদি হালদারকে দর্শন করে আসা যাক! ভাইপোদের দর্শন পেলাম, আর খুড়োকে দর্শন করলাম না, সেটা ভাল দেখায় না।'

বলিলাম—'ভাইপোদের কাছে তো খুড়োর ঠিকানা চেয়েছিলে। খুড়োর কাছে কি চাইবে?'

ব্যোমকেশ হাসিল—'একটা কিছু মাথায় এসেই যাবে।'

বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ বাহির হইলাম। বৌবাজারের নম্বরের ধারা কোন্‌দিক হইতে কোন্‌দিকে গিয়াছে জানা ছিল না, নম্বর দেখিতে দেখিতে শিয়ালদহের দিকে চলিয়াছি। কিছুদূর চলিবার পর ফুটপাতে বাঁটুল সর্দারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল—'কি বাঁটুল, এ পাড়াটাও কি তোমার এলাকা?'

বাঁটুল তৈলাক্ত মুখে কেবল হাসিল, তারপর পাল্‌টা প্রশ্ন করিল—'আপনারা এ পাড়ায় এলেন যে কর্তা? কিছু দরকার আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল—'হ্যাঁ।—১৭২।২, নম্বরটা কোন্‌দিকে বলতে পার?'

বাঁটুলের চোখে চকিত সতর্কতা দেখা দিল। তারপর সে সামলাইয়া লইয়া বলিল—'১৭২।২ নম্বর? ঐ যে নতুন বাড়িটা তৈরী হচ্ছে, ওর পাশেই।'

আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া

দেখি বাঁটুল তখনও ফুটপাতে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া সে উল্‌টা মুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি বলিলাম—'ওহে ব্যোমকেশ বাঁটুল—'

সে বলিল—'লক্ষ্য করেছি। বোধ হয় ওদের চেনে।'

আরও খানিকদূর অগ্রসর হইবার পর নূতন বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম। চারিদিকে ভারা বাঁধা, মিস্ত্রীরা গাঁথুনীর কাজ করিতেছে। একতলার ছাদ ঢালা হইয়া গিয়াছে, দোতলার দেয়াল গাঁথা হইতেছে। সম্মুখে কণ্ট্রাক্টরের নাম লেখা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। কণ্ট্রাক্টরের নাম গুরুদত্ত সিং। সম্ভবত শিখ।

বাড়ি পার হইয়া একটি সঙ্কীর্ণ ইট-বাঁধানো গলি, গলির ওপারে ১৭২।২ নম্বর বাড়ি। দোতলা বাড়ি, সদর দরজার পাশে সরু এক ফালি দাওয়া; তাহার উপরে তাহারই অনুরূপ রেলিং-ঘেরা ব্যাল্‌কনি। নীচের দাওয়ায় বসিয়া এক জীর্ণকায় পলিতকেশ বৃদ্ধ থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি হুঁকা হইতে ওষ্ঠাধর বিমুক্ত না করিয়াই চোখ বাঁকাইয়া চাহিলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—'এটা কি অনাদি হালদারের বাসা?'

বৃদ্ধ হুঁকার ছিদ্র হইতে অধর বিচ্ছিন্ন করিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন—'কে অনাদি হালদার আমি কি জানি। এ আমার বাসা—নীচের তলায় আমি থাকি।'

ব্যোমকেশ বিনীতস্বরে বলিল—'আর ওপরতলায়?'

বৃদ্ধ পূর্ববৎ খিঁচাইয়া বলিলেন—'আমি কি জানি। খুঁজে নাওগে। অনাদি হালদার! যত সব—' বৃদ্ধ আবার হুঁকায় অধরোষ্ঠ জুড়িয়া দিলেন।

বৃদ্ধ হঠাৎ এমন তেরিয়া হইয়া উঠিলেন কেন বোঝা গেল না। আমরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। লম্বাটে গোছের একটি ঘর, তাহার একপাশে একটি দরজা, বোধ হয় নীচেরতলার প্রবেশদ্বার; অন্য দিকে এক প্রস্থ সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিব কি না ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে দুম্ দুম্ শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখিলাম ইয়া লম্বা-চওড়া এক সর্দারজী বাঁকের মোড় ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছেন। অনাদি হালদারের বাসা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কারণ ইনি নিশ্চয় কণ্ট্রাক্টর গুরুদত্ত সিং। তাঁহার পরিধানে মখ্‌মলী কর্‌ডুরয়ের পাৎলুন ও গ্যাবারডিনের কোট, দাড়ি বিনুনি করা, মাথায় কান-চাপা পাগ্‌ড়ী। দুই বাহু মুগুরের মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি নামিতেছেন, চক্ষু দুটিও ঘুরিতেছে। আরও কাছে আসিলে তাঁহার দাড়ি-গোঁফে অবরুদ্ধ বাক্যগুলিও আমাদের কর্ণগোচর হইল। বাক্যগুলি বাঙলা নয়, কিন্তু তাহার ভাবার্থ বুঝিতে কষ্ট হইল না—'বাংগালী আমার টাকা দেবে না। দেখে নেব কত বড় অনাদি হালদার, গলা টিপে টাকা আদায় করব। আমিও পাঞ্জাবী, আমার সঙ্গে লারে-লাপ্‌পা চলবে না—' সর্দারজী সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, নিম্নস্বরে বলিল—'অনাদিবাবু দেখছি জনপ্রিয় লোক নয়। এস দেখা যাক।'

সিঁড়ির উর্ধ্বপ্রান্তে একটি দরজা ভিতর দিকে অর্গলবদ্ধ। ব্যোমকেশ কড়া নাড়িল।

অল্পকাল পরে দরজা একটু ফাঁক হইল, ফাঁকের ভিতর দিয়া একটি মুখ বাহির হইয়া আসিল। ভেট্‌কি মাছের মত মুখ,

রাঙা রাঙা চোখ, চোখের নীচের পাতা শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। শিথিল অধরের ফাঁকে নীচের পাটির দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে।

রাত্রিকালে এরূপ অবস্থায় এই মুখখানি দেখিলে কি করিতাম বলা যায় না, কিন্তু এখন একবার চমকিয়া স্থির হইলাম। ব্যোমকেশ বলিল—'অনাদিবাবু— ?'

মুখটিতে হাসি ফুটিল, চোয়ালের অসংখ্য দাঁত আরও প্রকটিত হইল। ভাঙা ভাঙা গলায় ভেটকি মাছ বলিল—'না, আমি অনাদিবাবু নই, আমি কেষ্টবাবু। আপনারাও পাওনাদার নাকি ?'

'না, অনাদিবাবুর সঙ্গে আমাদের একটু কাজ আছে ?'

এই সময় ভেট্‌কি মাছের পশ্চাতে আর একটি দ্রুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, —'কেষ্টবাবু, সরুন সরুন—'

কেষ্টবাবুর মুণ্ড অপসৃত হইল, তৎপরিবর্তে দ্বারের সম্মুখে একটি যুবককে দেখা গেল। ডিগ্‌ডিগে রোগা চেহারা, লম্বা ছুঁচালো চিবুক, মাথার কড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলি মাথার দুই পাশে যেন পাখা মেলিয়া আছে। মুখে একটা চটপটে ভাব।

'কি চান আপনারা ?'

'অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কিছু দরকার আছে কি ? অনাদিবাবু বিনা দরকারে কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।'

'দরকার আছে বৈ কি। পাশে যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে সেটা বোধহয় তাঁরই। ওই বাড়ি সম্বন্ধে কিছু জানবার আছে। আপনি—?'

'আমি অনাদিবাবুর সেক্রেটারি। আপনারা একটু বসুন, আমি খবর দিচ্ছি। এই যে, ভেতরে বসুন।'

আমরা সিঁড়ি হইতে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। যুবক চলিয়া গেল।

ঘরটি নিরাভরণ, কেবল একটি কেঠো বেঞ্চি আছে। আমরা বেঞ্চিতে বসিয়া চারিদিকে চাহিলাম। সিঁড়ির দরজা ছাড়া ঘরে আরও গুটিতিনেক দরজা আছে, একটি দিয়া সদরের ব্যালকনি দেখা যাইতেছে, অন্য দুইটি ভিতর দিকে গিয়াছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম ভিতর দিকের একটি দরজা একটু ফাঁক করিয়া একটি স্ত্রীলোক উঁকি মারিল। চিনিতে কষ্ট হইল না—ননীবালা দেবী। তিনি বোধহয় রান্না করিতেছিলেন, বাহিরে লোক আসাব সাড়া পাইয়া খুন্তি হাতে তদারক করিতে আসিয়াছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি সভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। ব্যোমকেশ নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া তাঁহাকে অভয় দিল। ননীবালা ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

অন্য দরজা দিয়া যুবক বাহির হইয়া আসিল।

'আসুন।'

যুবকের অনুগামী হইয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি ঘরের দরজা ঠেলিয়া যুবক বলিল—'এই ঘরে অনাদিবাবু আছেন, আপনারা ভেতরে যান।'

ঘরে ঢুকিয়া প্রথমটা কিছু ঠাহর হইল না। ঘরে আলো কম, আসবাব কিছু নাই, কেবল এক কোণে গদির উপর ফরাস পাতা। ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া একটি লোক আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। আধা অন্ধকাবে মনে হইল একটা ময়াল সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া অনিমেষ চক্ষে শিকারকে লক্ষ্য করিতেছে।

চক্ষু অভ্যস্ত হইলে বুঝিলাম, ইনিই অনাদি হালদার বটে; ভাইপোদের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। বয়স আন্দাজ

পঞ্চাশ ; বেঁটে মজবুত চেহারা, চোখে মেদমণ্ডিত মোঙ্গলীয় বক্রতা। গায়ে বেগুনি রঙের বালাপোষ জড়ানো।

আমরা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনাদিবাবু স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ব্যোমকেশ নিজেই কথা কহিল—'আমরা একটু কাজে এসেছি। ইনি অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ববঙ্গ থেকে সম্প্রতি এসেছেন, কলকাতায় বাড়ি কিনে বাস করতে চান।'

অনাদিবাবু এবার কথা বলিলেন। আমাদের বসিতে বলিলেন না, স্বভাব-রুক্ষ স্বরে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি কে?'

ব্যোমকেশের চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সহজভাবে বলিল—'আমি এর এজেন্ট। জানতে পারলাম আপনি পাশেই বাড়ি তৈরি করাচ্ছেন, ভাবলাম হয়তো বিক্রি করতে পারেন। তাই—'

অনাদিবাবু বলিলেন—'আমি নিজে বাস করব বলে বাড়ি তৈরি করাচ্ছি, বিক্রি করবার জন্যে নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল—'তা তো বটেই। তবে আপনি ব্যবসাদার লোক, ভেবেছিলাম লাভ পেলে ছেড়ে দিতে পারেন।'

'আমি দালালের মারফতে ব্যবসা করি না।'

'বেশ তো, আপনি অজিতবাবুর সঙ্গে কথা বলুন, আমি সরে যাচ্ছি।'

'না, কারুর সঙ্গে বাড়ির আলোচনা করতে চাই না। আমি বাড়ি বিক্রি করব না। তোমরা যেতে পারো।'

অতঃপর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। এই অত্যন্ত অশিষ্ট লোকটার সঙ্গ আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ নির্বিকার মুখে বলিল—'কিছু মনে করবেন না, বাড়িটা তৈরি করাতে আপনার কত খরচ হবে বলতে বাধা আছে কি?'

অনাদিবাবুর রুক্ষ স্বর আরও কর্কশ হইয়া উঠিল—'বাধা আছে।—ন্যাপা। ন্যাপা! বিদেয় কর, এদের বিদেয় কর—'

সেক্রেটারি যুবকের নাম বোধ করি ন্যাপা, সে দ্বারের বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল, মুণ্ড বাড়াইয়া ত্বরান্বিত স্বরে বলিল,—'আসুন, চলে আসুন—'

মানসিক গলা-ধাক্কা খাইয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। যুবক সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিল, একটু লজ্জিত হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'কিছু মনে করবেন না, কর্তার আজ মেজাজ ভাল নেই।'

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'কিছু না।—এসো অজিত।'

রাস্তায় বাহির হইয়া আসিলাম। ব্যোমকেশ মুখে যতই তাচ্ছিল্য দেখাক, ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর সে আমার দিকে চাহিয়া ক্লিষ্ট হাসিল, বলিল—'দু'রকম ছোটলোক আছে—অসভ্য ছোটলোক আর বজ্জাত ছোটলোক। যারা বজ্জাত ছোটলোক তারা শুধু পরের অনিষ্ট করে; আর অসভ্য ছোট-লোক নিজের অনিষ্ট করে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'অনাদি হালদার কোন শ্রেণীর ছোট-লোক?'

'অসভ্য এবং বজ্জাত দুইই।'—

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু দিবানিদ্রা দিব কিনা ভাবিতেছি, দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখি ননীবালা দেবী।

ননীবালা শঙ্কিত মুখ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ ইজিচেয়ারে ঝিমাইতেছিল, উঠিয়া বসিল। ননীবালা বলিলেন—'আজ আপনাদের ও-বাড়িতে দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছল। অনাদিবাবু যদি জানতে পারেন যে আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল—'বসুন। অনাদিবাবুর জানবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমরা গিয়েছিলাম তার নতুন বাড়ির খরিদ্দার সেজে। সে যাক, আপনি এখন একটা কথা বলুন তো, অনাদি হালদার কি রকম লোক? সোজা স্পষ্ট কথা বলবেন, লুকো-ছাপার দরকার নেই।'

ননীবালা কিছুক্ষণ ড্যাবডেবে চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত শব্দের স্রোত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল,—'কি বলব আপনাকে ব্যোমকেশবাবু—চামার! চামার! চোখের চামড়া নেই, মুখের রাশ নেই। একটা মিষ্টি কথা ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না, একটা পয়সা ওর ট্যাঁক থেকে বেরোয় না। টাকার আণ্ডিল, কিন্তু আঙুল দিয়ে জল গলে না। এদিকে উন থেকে চূণ খসলে আর রক্ষে নেই, দাঁতে ফেলে চিবোবে। আগে একটা বামুন ছিল, আমি আসবার পর সেটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে; এই দেড় বছর হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে আমার গতরে আর কিছু নেই। কি কুক্ষণে যে প্রভাতকে ওর পুষ্যিপুত্তুর হতে দিয়েছিলুম! যদি উপায় থাকত হতচ্ছাড়া মিন্‌ষের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে পাটনায় ফিরে যেতুম।' এই পর্যন্ত বলিয়া ননীবালা রণক্লান্ত যোদ্ধার মত হাঁপাইতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল—'কতকটা এইরকমই আন্দাজ করেছিলাম। প্রভাতের সঙ্গে ওর ব্যবহার কেমন?'

ননীবালা একটু থমকিয়া বলিলেন—'প্রভাতকে বেশী ঘাঁটায় না। তাছাড়া প্রভাত বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ। সকাল আটটায় দোকানে বেরিয়ে যায়, দুপুরবেলা আধঘণ্টার জন্য একবারটি খেতে আসে, তারপর বাড়ি ফেরে একেবারে রাত নটায়। বুড়োর সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না।

'বুড়ো দোকানের হিসেবপত্র দেখতে চায় না?'

'না, হিসেব চাইবার কি মুখ আছে, দোকান যে প্রভাতের নামে। বুড়ো প্রথম প্রথম খুব ভালমানুষী দেখিয়েছিল। প্রভাতকে জিগ্যেস করল—কী কাজ করবে? প্রভাত বলল—বইয়ের দোকান করব। বুড়ো অমনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দিলে।'

'হুঁ। —ন্যাপা কে? বুড়োর সেক্রেটারি?'

ননীবালা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—'সেক্রেটারি না আরও কিছু—বাজার সরকার। ফড়্ফড়্ করে ইংরিজি বলতে পারে তাই বুড়ো ওকে রেখেছে। বুড়ো নিজে একবর্ণ ইংরিজি জানে না, ব্যবসার কথাবার্তা ওকে দিয়ে করায়, চিঠিপত্র লেখায়। তাছাড়া বাজার করায়, হাত-পা টেপায়। সব করে ন্যাপা।'

'ভারি কাজের লোক দেখছি।'

'ভারি ধুর্ত লোক, নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। দু'পাতা ইংরিজি পড়েছে কিনা।'

বুঝিলাম, প্রভাত ইংরিজি জানে না, ন্যাপা ইংরিজি জানে তাই ননীবালা তাহার প্রতি প্রসন্ন নয়।

ব্যোমকেশ বলিল—'আর কেষ্টবাবু? তিনি কে?

'তিনি কে তা কেউ জানে না। বুড়োর আত্মীয় কুটুম্ব নয়, জাত আলাদা। আমরা আসবার আগে থাকতে আছে। মাতাল, মদ খায়।'

'তাই নাকি? নিজের পয়সাকড়ি আছে বুঝি?'

'কিচ্ছু নেই। বুড়ো জুতো জামা কিনে দেয় তবে পরে।'

'তবে মদ পায় কোথা থেকে?'

'মদের পয়সাও বুড়ো দেয়।'

আশ্চর্য! এদিকে বলেছেন আঙুল দিয়ে জল গলে না—'

'কি জানি ব্যোমকেশবাবু আমি কিছু বুঝতে পারি না। মনে হয় বুড়ো ওকে ভয় করে। কেষ্টবাবু মাঝে মাঝে মদ খেয়ে মেজাজ দেখায়, বুড়ো কিন্তু কিছু বলে না।'

'বটে।' ব্যোমকেশ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

ননীবালা তখন সাগ্রহে বলিলেন—'কিন্তু ওদিকের কি হল ব্যোমকশবাবু? নিমাই নিতাইকে দেখিতে গিছলেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল—'গিয়েছিলাম। ওরা লোক ভাল নয়। খুড়ো আর ভাইপোদের এ বলে আমায় ছ্যাখ্ ও বলে আমায় দ্যাখ্। উচ্চের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তেতো।'

ননীবালা ভীতকণ্ঠে বললেন—'তবে কি হবে? ওরা যদি প্রভাতকে—।'

ব্যোমকেশ ধীরস্বরে বলিল—'ওরা প্রভাতকে ভালবাসে না, তার অনিষ্ট চিন্তাও করতে পারে। কিন্তু আজকালকার এই অরাজ-কতার দিনেও একটা মানুষকে খুন করা সহজ কথা নয়, নেহাৎ মাথায় খুন না চাপলে কেউ খুন করে না। নিমাই আর নিতাইকে দেখে মনে হয় ওরা সাবধানী লোক, খুন করে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়াবে এমন লোক তারা নয়। আর একটা কথা ভেবে দেখুন। অনাদি হালদার যদি পুষ্যিপুত্তুর নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে তাহলে একটা পুষ্যিপুত্তুরকে মেরে লাভ কি? একটা গেলে অনাদি হালদার আর একটা পুষ্যিপুত্তুর নিতে পারে, নিজের সম্পত্তি উইল করে বিলিয়ে দিতে পারে। এ অবস্থায় খুন-খারাবি করতে যাওয়া তো ঘোর বোকামি। বরং—'

ননীবালা বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করিলেন—'বরং কী?'

ব্যোমকেশ বলিল—'বরং অনাদিবাবুর ভালমন্দ কিছু হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।'

ননীবালা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন, মনে হইল এই

সম্ভাবনার কথা তিনি পূর্বে চিন্তা করেন নাই। তারপর তিনি উৎসুক মুখ তুলিয়া বলিলেন—'তাহলে—প্রভাতের কোনও ভয় নেই?'

আপনি নিশ্চিন্ত হতে পাবেন, এ ধরনের বোকামী নিমাই নিতাই করবে না। তবু সাবধানেব মার নেই। আমি একটা প্ল্যান ঠিক করেছি, এমনভাবে ওদের কড়্‌কে দেব যে ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে সাহস করবে না।'

'কি—কি প্ল্যান ঠিক করেছেন ব্যোমকেশবাবু?'

'সে আপনার শুনে কি হবে। আপনি আজ বাড়ি যান। যদি বিশেষ খবর কিছু থাকে আমাকে জানাবেন।'

ননীবালা তখন গদগদ মুখে ব্যোমকেশকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। অনাদি হালদারের দ্বিপ্রহরে দিবানিদ্রা দিবার অভ্যাস আছে, সেই ফাঁকে ননীবালা বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন; বুড়া যদি জাগিয়া উঠিয়া দেখে তিনি বহির্গমন করিয়াছিলেন তাহা হইলে কৈফিয়তের ঠেলায় ননীবালাকে অন্ধকার দেখিতে হইবে।

অতঃপর আমি ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কী প্ল্যান ঠিক করেছ? আমাকে তো কিছু বলনি।'

বোমকেশ বলিল—'বাড়িতে পোস্টকার্ড আছে?'

'আছে।'

'বেশ পোষ্টকার্ড নাও, একখানা চিঠি লেখ। শ্রীহরিঃ শরণং লিখিতে হবে না, সম্বোধনেরও দরকার নেই। লেখ—'আমি তোমাদের উপর নজর রাখিয়াছি।'—ব্যাস্ আর কিছু না! এবার নিমাই কিংবা নিতাই হালদারের ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।'

চার

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে।

ননীবালা আর আসেন নাই। প্রভাত ঘটিত ব্যাপার অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছে মনে হয়। কেবল বাঁটুল সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা হইয়াছিল। বাঁটুল আসিয়াছিল একটি রিভলবার আমাদের গছাইবার জন্য। উচিত মূল্যে পাইলে হয়তো কিনিতাম, কিন্তু ছয়শত টাকা দিয়া ফ্যাসাদ কিনিবার শখ আমাদের ছিল না। ব্যোমকেশ বাঁটুলকে সিগারেট দিয়া অন্য কথা পড়িয়াছিল।

'১৭২।২ বৌবাজার স্ট্রীটের কাউকে চেনো নাকি বাঁটুল?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'অনাদি হালদারকে জানো?'

'আজ্ঞে।'

'সেও কি তোমার—মানে—খাতক নাকি?'

বাঁটুল একটু হাসিয়াছিল অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি নিভাইয়া সযত্নে পকেটে রাখিয়া একটু গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিল—অনাদি হালদার আগে চাঁদা দিত, কয়েক মাস থেকে বন্ধ করে দিয়েছে; এখন যদি ওর ভাল-মন্দ কিছু হয় আমাদের দায়-দোষ নেই।—কিন্তু আপনারা ওকে চিনলেন কি করে? আগে থাকতে জানা শোনা আছে নাকি?'

'না, সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে।'

বাঁটুল অতঃপর আর কৌতূহল প্রকাশ করে নাই, কেবল অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রবাদ-বাক্য আমাদের শুনাইয়া দিয়া

ধীরে ধীরে প্রস্থান করিয়াছিল—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করলে ভাল হয় না কর্তা।'

কালীপূজার দিন আসিয়া পড়িল। সকাল হইতেই চারিদিকে দুম্‌দাম্‌ শব্দ শোনা যাইতেছে। সেগুলি উৎসবের বাদ্যোদ্যম কিংবা সম্মুখ সমরের রণদামামা তাহা নিঃসংশয়ে ঠাহর করিতে না পারিয়া আমরা বাড়িতেই রহিলাম।

সন্ধ্যার পর দীপমালায় নগর শোভিত হইল। রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে বাজি পোড়ানো আরম্ভ হইল ; তুব্‌ড়ি আতস বাজি ফানুস রঙমশাল, সঙ্গে সঙ্গে চীনে পট্‌কা দোদমা। পথে পথে অসংখ্য মানুষ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছে ; কেহ পদব্রজে, কেহ গাড়ী মোটরে। মাথার উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খাঁড়া ঝুলিতেছে, কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে! হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়।

আমরা বাড়ির বাহির হইলাম না, জানালা দিয়া উৎসব শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। এজন্য যদি কেহ আমাদের কাপুরুষ বলিয়া বিদ্রূপ করেন আপত্তি করিব না, কিন্তু বলির ছাগশিশুর ন্যায় গলায় ফুলের মালা পরিয়া নির্বোধ আনন্দে নৃত্য করিতে আমাদের ঘোর আপত্তি।

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। মধ্য-রাত্রে কালীপূজা, উৎসব পুরাদমে চলিয়াছে। আমরা যদিও শক্তির উপাসক নই, বুদ্ধির উপাসক ; তবু মা কালীকে অসন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। রাত্রে পলান্ন সহযোগে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই যে প্রভাত ঘটিত ব্যাপার সাপের মত আবার মাথা তুলিবে তাহা তখনও জানিতাম না।

একেবারে ঘুম ভাঙিল রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়। চারিদিক নিস্তব্ধ, জানালা দিয়া বেশ ঠাণ্ডা আসিতেছে। আমি পায়ের তলা

হইতে চাদরটা গায়ে জুত করিয়া জড়াইয়া আর এক ঘুম দিবার ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময় উৎকট শব্দে ঘুমের নেশা ছুটিয়া গেল।

কে দুদ্দাড় শব্দে দরজা ঠেঙাইতেছে। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ভাবিলাম, সম্মুখ সমরের সীমানা আমাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আজ আর রক্ষা নাই। মোটা লাঠিটা ঘরের কোণে দণ্ডায়মান ছিল, সেটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলাম। যদি মরিতেই হয় লড়িয়া মরিব।

ওদিকে ব্যোমকেশও লাঠি হাতে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। সদর দরজা মজবুত বটে কিন্তু আর বেশীক্ষণ নয়, এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। আমরা দরজার দু'পাশে লাঠি বাগাইয়া দাঁড়াইলাম।

দুদ্দাড় শব্দ ক্ষণেকের জন্য একবার থামিল, সেই অবকাশে একটি ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'ও ব্যোমকেশবাবু—এক-বারটি দরজা খুলুন—'

আমরা বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম। পুরুষের গলা, কেমন যেন চেনা-চেনা। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'কে তুমি? নাম বল।'

উত্তব হইল—'আমি—আমি কেষ্ট দাস—শিগ্‌গির দরজা খুলুন—'

কেষ্ট দাস! সহসা স্মরণ হইল না, তারপর মনে পড়িয়া গেল। অনাদি হালদারের বাড়ির কেষ্টবাবু!

ব্যোমকেশ বলিল—'এত রাত্রে কী চান? সঙ্গে কে আছে?

'সঙ্গে কেউ নেই, আমি একা।'—

মাত্র একটা লোক এত শব্দ করিতেছিল! সন্দেহ দূর হইল না। ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করিল—'এতরাত্রে কী দরকার?'

'অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে। দয়া করে দরজা খুলুন। আমার বড় বিপদ।'

হতভম্ব হইয়া আবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। অনাদি হালদার—!

ব্যোমকেশ আর দ্বিধা করিল না, দ্বার খুলিয়া দিল। কেষ্টবাবু টলিতে টলিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। কেষ্টবাবুর চেহারা আলু-থালু, ভেট্‌কি মাছের মত মুখে ব্যাকুলতা। তদুপরি মুখ দিয়া তীব্র মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি থপ্‌ করিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—'অনাদিকে কেউ গুলি করে মেরেছে। সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না। আমি বাড়িতে ছিলাম না—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল,—'ও কথা পরে হবে। আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। আমাকে আপনি চিনলেন কি করে? ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে একটু ভিজা-বিড়াল ভাব প্রকাশ পাইল। অবশেষে তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন—'সেদিন আপনারা আমাদের বাসায় গিছলেন, আপনাদের দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাই আপনারা যখন ফিরে চললেন তখন আমি আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম। এখানে এসে নীচের হোটেলে আপনার পরিচয় পেলাম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'হুঁ, আপনি দেখছি ভারি হুঁশিয়ার লোক। অনাদি হালদারের কাঁধে চেপে থাকেন কেন?'

কেষ্টবাবু বলিলেন—'আমি—অনাদির ছেলেবেলার বন্ধু—দুর-বস্থায় পড়েছি—তাই—'

'তাই অনাদি হালদার আপনাকে খেতে পরতে দিচ্ছিল, এমন কি মদের পয়সা পর্যন্ত যোগাচ্ছিল। খুব গাঢ় বন্ধুত্ব বলতে

হবে।—যাক, এবার আজকের ঘটনা বলুন। গোড়া থেকে বলুন।'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ অপলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ঈষৎ করুণ স্বরে বলিলেন,—'আপনি দেখছি সবই জানেন। কিন্তু সত্যি বলছি আমি অনাদিকে খুন করিনি। আজ বিকেল বেলা—মানে কাল বিকেল বেলা অনাদির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। আমি বলেছিলুম, আজ কালীপূজো, আজ আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া। অনাদি আমাকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিল—এই নিয়ে বেরিয়ে যাও, আর আমার বাড়িতে মাথা গলিও না।'

'কে কে আপনাদের ঝগড়া শুনেছিল ?'

'বাড়িতে ননীবালা আর ন্যাপা ছিল। নীচের তলার ষষ্টিবাবুও ঝগড়া শুনেছিল। বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিল, আমি নেমে আসতে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—মাথার ওপর দিনরাত শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ চলেছে—কবে যে পাপ বিদেয় হবে জানি না।'

'তারপর বলুন।'

তারপর রাত্রি আন্দাজ একটার সময় আমি ফিরে এলাম। এসে দেখি—'

'রাত্রি একটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ?'

'আপনার কাছে লুকোব না, শুঁড়ির দোকানে বসে মদ খেয়েছিলাম—জুয়ার আড্ডায় জুয়া খেলে তিরিশ টাকা জিতেছিলাম —তারপর একটু এদিক ওদিক—'

'হুঁ। বাসায় ফিরে কী দেখলেন ?'

'বাসায় ফিরে প্রথমেই দেখি নীচের তলায় ষষ্টিবাবু হুঁকো হাতে সিঁড়ির ঘরে পায়চারি করছে। আমাকে দেখে বলে উঠল

—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। কিছু বুঝতে পারলাম না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি—সিঁড়ির দরজা ভাঙা।

'ঘরে ঢুকে দেখলাম বেঞ্চির ওপর প্রভাত আর ন্যাপা বসে আছে, ননীবালা দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে মেঝেয় বসেছে। আমাকে দেখে তিনজনে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল, যেন আগে কখনও দেখেনি। আমি তো অবাক। বললাম—একি, তোমরা বসে আছ কেন? কারুর মুখে কথা নেই। তারপর ন্যাপা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—কেষ্টবাবু, এ আপনার কাজ। আপনি কর্তাকে খুন করেছেন।

'খুন! আমার তো মাথা ঘুরে গেল। জিগ্যেস করলাম—কে? কোথায়? কেন? কেউ উত্তর দিল না। শেষে প্রভাত বলল—ঐ ব্যাল্‌কনিতে গিয়ে দেখুন।

'রাস্তার ধারের ব্যাল্‌কনিতে উঁকি মারলাম। অনাদি পড়ে আছে, রক্তারক্তি কাণ্ড। বুকে বন্দুকের গুলি লেগেছে। দেখে আমার ভির্মি যাওয়ার মত অবস্থা, মেঝেয় বসে পড়লাম। মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যেতে লাগল।

'তারপর কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। ওরা তিন জনে চাপা গলায় কথা কইছে, কি করা উচিত তাই নিয়ে তর্ক করছে। ওদেব কথা থেকে বুঝতে পারলাম, সন্ধ্যের পর ওরা কেউ বাড়ি ছিল না, একা অনাদি বাড়িতে ছিল। রাত্রি বারোটা নাগাদ ওরা ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া পেল না। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর ওদের ভয় হল, হয়তো কিছু ঘটেছে। ওরা তখন দরজা ভেঙে বাসায় ঢুকে দেখল ব্যাল্‌কনিতে অনাদি মরে পড়ে আছে।

'আমার মাথাটা একটু পরিষ্কার হলে আমি বললাম—তোমরা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন—আমি অনাদিকে খুন করব কেন?

অনাদি আমার অন্নদাতা বন্ধু—। হ্যাপা লাফিয়ে উঠে বলল—ন্যাকামি করবেন না। আমি যাচ্ছি পুলিসে খবর দিতে। এই বলে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

'আমার ভয় হল। পুলিস এসে আমাকেই ধরবে। ওরা সাক্ষী দেবে আমার সঙ্গে অনাদির ঝগড়া হয়েছিল। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না, উঠে পালিয়ে এলাম। কোথায় যাব কিছুই জানি না ; রাস্তায় নেমে আপনার কথা মনে পড়ল।'—

কিছুক্ষণ কথা হইল না, কেষ্টবাবু যেন ঝিমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম ঝিমানোর মধ্যে তাহার অর্ধনিমীলিত চক্ষু দুটি বার বার ব্যোমকেশের মুখের উপর যাতায়াত করিতেছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল,—'আপনি তাহলে অনাদি হালদারকে খুন করেন নি।'

কেষ্টবাবু চমকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন—'অ্যাঁ! না ব্যোম-কেশবাবু, আমি খুন করিনি। আপনিই ভেবে দেখুন, অনাদিকে খুন করে আমার লাভ কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'অনাদি হালদার আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।'

কেষ্টবাবু বলিলেন,—'সে ওর মুখের কথা, রাগের মুখে বলেছিল। আমাকে সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দেবার সাহস অনাদির ছিল না।'

'সাহস ছিল না! অর্থাৎ আপনি অনাদি হালদারের জীবনের কোনও গুরুতর গুপ্তকথা জানেন।'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, —'অনাদির সব গুপ্তকথা আমি জানি, তাকে আমি ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারতাম। কিন্তু ও কথা এখন থাক, যদি দরকার হয় পরে বলব, ব্যোমকেশবাবু। এখন আমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করুন।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—'আপনাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে কে সত্যি খুন করেছে সেটা জানা দরকার। ঘটনাস্থলে যেতে হবে।'

কেষ্টবাবু শঙ্কিত হইলেন, স্খলিতস্বরে বলিলেন,—'আমাকেও যেতে হবে?'

'তা যেতে হবে বৈ কি। আপনি না গেলে আমি কোন্ সূত্রে যাব?'

'কিন্তু—সেখানে পুলিস বোধহয় এতক্ষণ এসে পড়েছে—'

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল,—'আপনি যদি খুন না করে থাকেন আপনার ভয়টা কিসের?—অজিত, তৈরী হয়ে নাও, আমরা তিন জনেই যাব।'

কেষ্টবাবু বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিলেন, আমরা বেশবাস পরিধান করিয়া তৈয়ার হইলাম। বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলে কেষ্টবাবু চেয়ার হইতে কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনার বাড়িতে একটু—হে হে—মদ পাওয়া যাবে? একটু হুইস্কি কিম্বা ব্র্যাণ্ডি—হাতে পায়ে যেন বল পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ বিরক্ত হইয়া বলিল,—'আমি বাড়িতে মদ রাখি না।—আসুন।'

পাঁচ

অনাদি হালদারের বাসায় যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে চারটা। কলিকাতা শহর তুপুর রাত্রি পর্যন্ত মাতামাতি করিয়া শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতেছে।

নীচের তলায় সদর দরজা খোলা। সিঁড়ির ঘরে কেহ নাই। ষষ্ঠিবাবু বোধ করি ক্লান্ত হইয়া শুইতে গিয়াছেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, দরজার হুড়কা ভাঙা; কবাট ভাঙে নাই, হুড়কাটা ভাঙিয়া একদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। আমরা ব্যোমকেশকে অগ্রে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম।

আমরা প্রবেশ করিতেই ঘরে যেন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ঘরে কিন্তু মাত্র তিনটি লোক ছিল; ননীবালা, প্রভাত ও ন্যাপা। তাহারা একসঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যাপা বলিয়া উঠিল—'কে? কে? কি চাই?' বলিয়াই আমাদের পশ্চাতে কেষ্টবাবুকে দেখিয়া থামিয়া গেল। ননীবালা থলথলে মুখে প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই উচ্চকণ্ঠে স্বগতোক্তি করিলেন—'অ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু!' তিনি আমাদের দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছেন মনে হইল না। প্রভাত বুদ্ধিহীনের মত চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া ননীবালার উদ্দেশ্যে বলিল,—'কেষ্টবাবু আমাকে ডেকে এনেছেন। পুলিস এখনও আসেনি?'

ননীবালা মাথা নাড়িলেন। ব্যোমকেশ ন্যাপার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিল—'আপনি—ব্যোমকেশবাবু—মানে—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। ইনি আমার বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন আমরা এসেছিলাম মনে আছে বোধ হয়। আপনি পুলিস ডাকতে গিয়েছিলেন না? কী হল?

ন্যাপা কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—'পুলিস হ্যাঁ, থানায় গিয়েছিলাম। থানায় কেউ ছিল না, একটা জমাদার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার কথা শুনে রেগে উঠল, বললে—যাও যাও, একটা হিন্দু মরেছে তার আবার এত হৈ-চৈ কিসের। লাশ রাস্তায় ফেলে দাওগে। আমি চলে আসছিলাম, তখন আমাকে ডেকে বললে—ঠিকানা রেখে যাও, সকালবেলা দারোগা সাহেব এলে জানাবো। আমি অনাদিবাবুর নাম আর ঠিকানা দিয়ে চলে এলাম।'

'ক্ষেত্রবিশেষে পুলিসের অবজ্ঞাপূর্ণ নির্লিপ্ততা এবং ক্ষেত্রান্তরে অতিরিক্ত কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে কোনও নূতনত্ব ছিল না; বস্তুত অভ্যাসবশেই আশা করিয়াছিলাম যে, পুলিস সংবাদ পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিবে। ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল,—'কেষ্টবাবুকে আপনারা অনাদিবাবুর হত্যাকারী ব'লে সন্দেহ করেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে এই ব্যাপারের তদন্ত করতে চাই। কারুর আপত্তি আছে?'

কেহ উত্তর দিল না, ব্যোমকেশের চক্ষু এড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তখন ব্যোমকেশ বলিল,—'লাশ ব্যাল্‌কনিতে আছে, আপনারা কেউ ছুঁয়েছেন কি?'

সকলে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

আমরা তখন ব্যালকনিতে প্রবেশ করিলাম। দেয়ালের গায়ে

বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছিল, তাহার নির্নিমেষ আলোতে দেখিলাম অনাদি হালদারের মৃতদেহ কাত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া আছে, মুখ রাস্তার দিকে। গায়ে শাদা রঙের গরম গেঞ্জি, তাহার উপর বালাপোশ। বুকের উপর হইতে বালাপোশ সরিয়া গিয়াছে, গেঞ্জিতে একটি ছিদ্র; সেই ছিদ্রপথে গাঢ় রক্ত নির্গত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃতের মুখের উপর পৈশাচিক হাসির মত একটা বিকৃতি জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ নত হইয়া পিঠের দিক হইতে বালাপোষ সরাইয়া দিল। দেখিলাম এদিকেও গেঞ্জির উপর একটি সুগোল ছিদ্র। এদিকে রক্ত বেশী গড়ায় নাই, কেবল ছিদ্রের চারিদিক ভিজিয়া উঠিয়াছে। বন্দুকের গুলি দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

মৃতদেহ ছাড়িয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্কভাবে বাহিরে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি হ্রস্বকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম,—'কি মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ অন্যমনে বলিল,—'এই লোকটাই সেদিন আমার সঙ্গে অসভ্যতা করেছিল—আশ্চর্য্য নয়?······মৃতদেহ শক্ত হতে আরম্ভ করেছে······বোধ হয় অনাদি হালদার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তায় বাজি পোড়ানো দেখছিল—' ব্যোমকেশ রাস্তার পরপারে বড় বাড়িটার দিকে তাকাইল—'কিন্তু গুলিটা গেল কোথায়? শরীরের মধ্যে নেই, শরীর ফুঁড়ে বেড়িয়ে গেছে—'

ব্যোমকেশের অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে গুলিটা ব্যালকনির দেয়ালে বিঁধিয়া থাকিবার কথা। কিন্তু ব্যালকনির দেয়াল ছাদ মেঝে কোথাও গুলি বা গুলির দাগ দেখিতে পাইলাম না। বন্দুকের গুলি দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় কখনও কখনও তেরছা পথে বাহির হয়; কিম্বা অনাদি হালদার

হয়তো তেরছাভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, গুলি ব্যালকনির পাশের ফাঁক দিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লাশ যেভাবে পড়িয়া আছে তাহাতে মনে হয়, অনাদি হালদার রাস্তার দিকে সুমুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বুকে গুলি খাইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িয়াছে, তারপর পাশের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সামনে রাস্তার ওপারে ওই বাড়িটা। মাঝে ৭০।৮০ ফুটের ব্যবধান। হয়তো ওই বাড়ির দ্বিতল বা ত্রিতলের কোনও জানালা হইতে গুলি আসিয়াছে।

ব্যালকনিতে গুলির কোনও চিহ্ন না পাইয়া ব্যোমকেশ আর একবার নত হইয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিল। বালাপোশ সরাইয়া লইলে দেখিলাম, নিম্নাঙ্গে ধুতির কষি আল্‌গা হইয়া গিয়াছে, কোমরে ঘুন্‌সির মত একটি মোটা কালো সূতা দেখা যাইতেছে। ঘুনসিতে ফাঁস লাগানো একটি চাবি। ব্যোমকেশ চাবিটি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, তারপর সন্তর্পণে খুলিয়া লইয়া মৃতদেহের উপর আবার বালাপোশ ঢাকা দিয়া বলিল,—'চল, দেখা হয়েছে।'

বাহিরে তখনও রাত্রির অন্ধকার কাটে নাই। রাস্তা দিয়া শাক-সব্জি বোঝাই লরী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা শহরের বিরাট ক্ষুধা মিটাইবার আয়োজন চলিতেছে।

ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, যে চারিজন লোক ঘরের মধ্যে ছিল তাহারা আগের মতই দাঁড়াইয়া আছে, কেহ নড়ে নাই। ব্যোমকেশ হাতের চাবি দেখাইয়া বলিল,—মৃতদেহের কোমরে ছিল। কোথাকার চাবি ?'

একে একে চারিজনের মুখ দেখিলাম। সকলেই একদৃষ্টে চাবির পানে চাহিয়া আছে, কেবল ন্যাপার মুখে ভয়ের ছায়া। অবশেষে ননীবালা বলিলেন,—'অনাদি বাবুর শোবার ঘরে লোহার আলমারি আছে, তারই চাবি।'

'লোহার আলমারিতে কি আছে? টাকাকড়ি?'

সকলেই মাথা নাড়িল, কেহ জানে না। ননীবালা বলিলেন,—কি করে জানব। অনাদিবাবু কি কাউকে আলমারি ছুঁতে দিত? কাছে গেলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠত—' প্রভাতের চোখের দিকে চাহিয়া ননীবালা থামিয়া গেলেন।

ন্যাপা অধর লেহন করিয়া বলিল,—'আলমারিতে টাকাকড়ি বোধ হয় থাকত না। কর্তা ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন।'

ব্যোমকেশ চাবি পকেটে রাখিয়া বলিল,—'আলমারিতে কি আছে পরে দেখা যাবে। এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।—বাড়িতে ঢোকবার বেরুবার রাস্তা ক'টা?'

সকলে ভাঙা দ্বারের দিকে নির্দেশ করিল,—মাত্র ওই একটা।'

'অন্য দরজা নেই?'

'না।'

ব্যোমকেশ বেঞ্চির একপাশে বসিয়া বলিল,—'বেশ। তার মানে অনাদিবাবুর যখন মৃত্যু হয় তখন বাড়িতে কেউ ছিল না, বাইরে থেকে গুলি এসেছে। প্রভাতবাবু আপনি বলুন দেখি, আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'

প্রভাত মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কিছুক্ষণ তাহার অগোছালো চুলে হাত বুলাইল, তারপর চোখ তুলিয়া বলিল,—'আমি মাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম আন্দাজ সাড়ে আটটার সময়।'

'ও—আপনারা দুজনে এক সঙ্গে বেরিয়েছিলেন?

'হ্যাঁ—মা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?' বলিয়া ব্যোমকেশ ননীবালার পানে চাহিল।

ননীবালা বলিলেন,—'আমার তো আর সিনেমা দেখা হয়ে ওঠে না, ন' মাসে ছ' মাসে একবার। কাল ঐ যে কি বলে শেয়ালদার কাছে সিনেমা আছে সেখানে 'জয় মা কালী' দেখাচ্ছিল, তাই দেখতে

গিছলুম। এ বাড়ির রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া আটটার মধ্যেই চুকে যায়, তাই রাত্তিরের শো'তে গিয়েছিলুম। প্রভাত বলল—'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল,—'আপনারা যখন বেরিয়েছিলেন তখন বাড়িতে কে কে ছিল?'

প্রভাত বলিল,—'কেবল অনাদিবাবু ছিলেন। নৃপেনবাবু আটটার পরই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ ন্যাপার দিকে ফিরিল—কিন্তু কোথায় ন্যাপা! সে এতক্ষণ ভিতর দিকের একটা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কখন অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ননীবালার দিকে ফিরিয়া হাত উল্টাইয়া প্রশ্ন করিল, ননীবালা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নীরবে দেখাইয়া দিলেন—ন্যাপা ওই দ্বার দিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্যোমকেশ তখন বিড়াল-পদক্ষেপে সেই দিকে চলিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

খানিকটা সরু গলির মতন, তারপর একটা ঘর। আলো জ্বলিতেছে। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের দেরাজ খুলিয়া ন্যাপা ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে এবং অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কিছু খুঁজিতেছে। আমাদের দ্বারের কাছে দেখিয়া সে তড়িদ্বেগে খাড়া হইল এবং দেরাজ বন্ধ করিয়া দিল।

আমরা প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ অপ্রসন্ন স্বরে বলিল,—'এটা আপনার ঘর?"

ন্যাপা কিছুক্ষণ বোকার মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'হ্যাঁ, আমার ঘর।'

'আপনি না বলে চলে এলেন কেন? কি করছেন?'

ন্যাপা পাংশুমুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'কিছু না—এই—একটা সিগারেট খাব বলে ঘরে এসেছিলাম—তা খুঁজে পাচ্ছি না—'

খুঁজিয়া না পাওয়ার কথা নয়, সিগারেটের প্যাকেট টেবিলের এক কোণে রাখা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল,—'ওটা কি? সিগারেটের প্যাকেট বলেই মনে হচ্ছে।'

ন্যাপা যেন আঁতকাইয়া উঠিল—'অ্যাঁ—! ও—হ্যাঁ—দেশলাই —দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না—'

ব্যোমকেশ একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিজের পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া দিল—'এই নিন।' ন্যাপা কম্পিত হস্তে দেশালাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইল।

আমি ঘরের চারিদিকে একবার তাকাইলাম। ক্ষুদ্র ঘর, আসবাবের মধ্যে তক্তপোশের উপর বিছানা, একটি দেরাজযুক্ত টেবিল ও তৎসংলগ্ন চেয়ার। ঘরে একটি গরাদ লাগানো জানালা আছে।

জানালাটা খোলা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল, আমিও গেলাম। আকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছে। জানালা দিয়া অর্ধ-সমাপ্ত নূতন বাড়িটা দেখা গেল। মাঝখানে গভীর খাদের মত গলি গিয়াছে।

'নৃপেনবাবু আপনার বাড়ী কোথায়?'

ব্যোমকেশের এই আকস্মিক প্রশ্নে নৃপেন প্রায় লাফাইয়া উঠিল। সে টেবিলের কিনারায় ঠেস্ দিয়া সিগারেটে লম্বা টান দিতেছিল, বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'বাড়ি—?'

'হ্যাঁ দেশ। নিবাস কোথায়? কোন্ জেলায়?

নৃপেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া বলিল,—'নিবাস? চব্বিশ পরগণা, ডায়মণ্ডহারবার লাইনের খেজুরহাটে।'

ব্যোমকেশ জানালার দিক হইতে ফিরিয়া নৃপেনের পানে চাহিয়া রহিল,—বলিল,—'খেজুরহাট! আপনি খেজুরহাটের রমেশ মল্লিককে চেনেন?'

নৃপেন দগ্ধাবশেষ সিগারেট ফেলিয়া দিয়া যেন ধূমরুদ্ধ স্বরে বলিল—চিনি। আমাদের পাড়ায় থাকেন।'

'খেজুরহাটে আপনার কে আছেন ?'

'খুড়ো।'

'বাপ নেই ?'

'না।'

'ভাল কথা, আপনার পুরো নামটা কী ?'

'নৃপেন দত্ত।'

ব্যোমকেশ নৃপেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একটু ঘনিষ্ঠতার সুরে বলিল,—'নৃপেনবাবু আপনাকে দেখে কাজের লোক বলে মনে হয়। আপনি কতদিন অনাদিবাবুর সেক্রেটারীর কাজ করছেন ?'

নৃপেন একটু ভাবিয়া বলিল,—'প্রায় চার বছর।'

'চার বছর ? এতদিন টিকে ছিলেন ?'

নৃপেন চুপ করিয়া রহিল।

'অনাদিবাবুর কেউ শত্রু ছিল কিনা আপনি নিশ্চয় জানেন ?'

নৃপেন অসহায় মুখ তুলিল,—'কার নাম করব ? যার সঙ্গে কর্তার পরিচয় ছিল তার সঙ্গেই শত্রুতা ছিল। ঝগড়া করা ছিল ওঁর স্বভাব।'

'বাড়ির সকলের সঙ্গেই ঝগড়া চল্‌ত ?'

'সকলকেই উনি গালমন্দ করতেন। কিন্তু আমরা ওঁর অধীন, আমাদের চুপ্‌ করে থাকতে হত। কেবল কেষ্টবাবু মাঝে মাঝে—'

'প্রভাতকে অনাদিবাবু গালমন্দ করতেন ?'

'ঠিক গালমন্দ নয়, সুবিধে পেলেই খোঁচা দিতেন। প্রভাতবাবু কিন্তু গায়ে মাখতেন না।'

'আচ্ছা, ওকথা থাক। বলুন দেখি কাল রাত্রে আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ?'

'আটটার পরই বেরিয়েছিলাম।'

'ফিরলেন কখন ?'

আন্দাজ একটায়। ফিরে দেখলাম, ননীবালা দেবী আর প্রভাত-বাবু দোর ঠেলাঠেলি করছেন।'

'আপনি আটটা থেকে একটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ?'

'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'আপনিও 'জয় মা কালী' দেখতে গিয়েছিলেন ?'

'না, আমি এলিটে একটা ইংরিজি ছবি দেখতে গিছলাম।'

'ও—অত রাত্রে ফিরলেন কি করে ?'

'হেঁটে।'

লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নৃপেন অনেকটা ধাতস্থ হইয়াছে, আগের মত ভীত বিচলিত ভাব আর নাই। ব্যোমকেশ বলিল,—'চলুন এবার ও ঘরে যাওয়া যাক।'

ছয়

তিনজনে ও ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, কেষ্টবাবু এবং প্রভাত বেঞ্চির দুই কোণে উপবিষ্ট। কেষ্টবাবু হাই তুলিতেছেন এবং আড়চক্ষে প্রভাতকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রভাত করতলে চিবুক রাখিয়া চিন্তামগ্ন। ননীবালা মেঝেয় পা ছড়াইয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেখিয়া সকলে সিধা হইলেন। প্রভাত বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—'বসুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বসব না। ভোর হয়ে এল, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এখনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে। আমাকে দেখলে পুলিসের মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। আপনাদের একটা কথা বলে রাখি মনে রাখবেন। কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবেন না, তাতে নিজেরই অনিষ্ট হবে, পুলিস হয়তো সকলকেই ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবে।'

সকলে চুপ করিয়া রহিল।

'প্রভাতবাবু এবার আপনার কথা বলুন। কাল আপনি আপনার মাকে সিনেমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, নিজে সিনেমা দেখেন নি?'

প্রভাত বলিল,—'না। আমি টিকিট কিনে মাকে সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে নিজের দোকানে গিয়েছিলাম।'

'ও।—রাত্রি সাড়ে আটটার পর দোকানে গেলেন?'

'হ্যাঁ।—দেয়ালীর রাত্রে দোকান আলো দিয়ে সাজিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর পৌনে বারোটার সময় দোকান বন্ধ করে আবার সিনেমায় গেলাম, সেখান থেকে মাকে নিয়ে ফিরে এলাম।'

'তাহলে আন্দাজ ন'টা থেকে পৌনে বারোটা পর্যন্ত আপনি দোকানেই ছিলেন। দোকানে আর কেউ ছিল?'

'গুরুং ছিল, দোরের সামনে পাহারা দিচ্ছিল।'

'গুরুং—মানে গুর্খা দরোয়ান। খদ্দের কেউ আসেননি?'

'না।'

'সারাক্ষণ দোকানে বসে কি করলেন?'

'কিছু না। পিছনে কুঠরিতে বসে বই বাঁধলাম।'

'আচ্ছা, ও কথা যাক।—অনাদিবাবুর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

প্রভাত ক্ষুব্ধ চোখ তুলিল,—'না। উনি আমাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন, প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করতেন। তারপর—ক্রমশ—'

'ক্রমশ ওঁর মন বদলে গেল? আচ্ছা উনি আপনাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন কেন?'

'তা জানি না।'

'প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করতেন, তারপর মন-মেজাজ বদলে গেল; এর কোনও কারণ হয়েছিল কি?'

'হয়তো হয়েছিল। আমি জ্ঞানত কোনও দোষ করিনি।'

প্রভাত ক্লান্তভাবে আবার বেঞ্চিতে বসিল। ব্যোমকেশ তাহাকে সদয়-চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'আপনি বরং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন গিয়ে। পুলিস একবার এসে পড়লে আর বিশ্রাম পাবেন কি না সন্দেহ।'

প্রভাত কিন্তু কেবল মাথা নাড়িল। ব্যোমকেশ তখন ননীবালার দিকে ফিরিয়া বলিল 'আপনার সঙ্গেও তো অনাদিবাবুর সদ্ভাব ছিল না।'

ননীবালা যুগপৎ মুখ এবং গো-চক্ষু ব্যাদিত করিয়া প্রায় কাঁদো

কাঁদো হইয়া উঠিলেন,—'আপনাকে তো সবই বলেছি ব্যোমকেশবাবু। আমি ছিলুম বুড়োর চক্ষুশূল। প্রভাতকে বুড়ো ভালবাসত, কিন্তু আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। রাতদিন ছুতো খুঁজে বেড়াতো; একটা কিছু পেলেই শুরু করে দিত দাঁতের বাদ্যি। এমন নীচ অন্তঃকরণ—' ননীবালা থামিয়া গেলেন। অনাদি হালদার মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মৃতদেহ অদূরেই পড়িয়া আছে—এই কথা সহসা স্মরণ করিয়াই বোধ করি আত্মসংবরণ করিলেন। অধিকন্তু অনাদি বাবুর সহিত তাঁহার অসদ্ভাবের প্রসঙ্গ অপ্রকাশ থাকাই বাঞ্ছনীয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিলম্বে উপলব্ধি করিলেন।

কেষ্টবাবুও সেই ইঙ্গিত করিলেন, হেঁচ্‌কি তোলার মত একটা হাসির শব্দ করিয়া বলিলেন,—'তাহলে শুধু আমার সঙ্গেই অনাদির ঝগড়া ছিল না!'

প্রভাত একবার ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'ও কথার কোনও মানে হয় না। দেখা যাচ্ছে সকলের সঙ্গেই অনাদি হালদারের ঝগড়া ছিল; তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। খুন করতে হলে যেমন খুন করার ইচ্ছে থাকা চাই, তেমনি খুন করার সুযোগও দরকার।' ব্যোমকেশ ননীবালার দিকে ফিরিয়া বলিল,—'কাল সিনেমা কেমন দেখলেন?'

ননীবালা আবার হাঁ করিয়া চাহিলেন।

'অ্যাঁ—সিনেমা—!'

'ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখেছিলেন?'

এতক্ষণে ননীবালা বোধ হয় প্রশ্নের মর্মার্থ অনুধাবন করিলেন, বলিলেন,—'ওমা, তা আবার দেখিনি! গোড়া থেকে শেষ অবধি দেখেছি, ছবি শেষ হয়েছে তবে বাইরে এসেছি। আমিও বাইরে এসে দাঁড়ালাম, আর প্রভাত এল। ওর সঙ্গে বাসায় চলে এলুম। এসে দেখি—'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'জানি। এবার চলুন অনাদি হালদারের শোবার ঘরে যাওয়া যাক। লোহার আলমারিটা দেখা দরকার।'

আমরা ছয়জন একজোট হইয়া অনাদি হালদারের শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম। কয়েকদিন আগে যে ঘরে অনাদি হালদারের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারই পাশের ঘর। নৃপেন দ্বারের পাশে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

ঘরটি আকারে প্রকারে নৃপেনের ঘরের মতই, তবে বাড়ির অন্য প্রান্তে। একটি গরাদযুক্ত জানালা খোলা রহিয়াছে। ঘরে একটি খাট এবং তাহার শিয়রে একটি স্টীলের আলমারি ছাড়া আর কিছু নাই।

আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলে ঘরে স্থানাভাব ঘটিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের সকলকে এ ঘরে দরকার নেই। কেষ্টবাবু, আপনি বরং ও ঘরে থাকুন গিয়ে। সিঁড়ির দরজা ভাঙা, এখুনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে।'

আলমারির ভিতর কী আছে, তাহা জানিবার কৌতূহল অন্যান্য সকলের মত কেষ্টবাবুরও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'কুছ পরোয়া নেই, আমিই মড়া আগ্‌লাবো। কিন্তু—এই সময় অন্তত এক পেয়ালা গরম চা পাওয়া 'যেত।' বলিয়া তিনি সস্পৃহভাবে হাত ঘষিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চা হলে মন্দ হত না'—সে ননীবালার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফিরাইল।

ননীবালা অনিচ্ছাভাবে বলিলেন,—'চা আমি করতে পারি। কিন্তু দুধ নেই যে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুধের বদলে লেবুর রস চলতে পারে।'

কেষ্টবাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন 'আদা! আদা! আদার রস দিয়ে চা খান, শরীর চাঙ্গা হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আদার রসও চলবে।'

ননীবালা ও কেষ্টবাবু প্রস্থান করিলে নৃপেন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আমাকে দরকার হবে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকেই দরকার। প্রভাতবাবু বরং নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন।'

প্রভাত একবার যেন দ্বিধা করিল, তারপর কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ঘরে রহিলাম আমরা দুজন ও নৃপেন।

ঘরে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নাই। খাটের উপর বিছানা পাতা; পরিষ্কার বিছানা, গত রাত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। দেয়ালে আলনায় একটি কাচা ধুতি পাকানো রহিয়াছে। এক কোণে গেলাসঢাকা জলের কুঁজা। ব্যোমকেশ এদিকে ওদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া পকেট হইতে চাবি বাহির করিল।

আলমারিটা নূতন। বার্নিশ করা কাঠের মত রঙ, লম্বা সরু আকৃতি, অত্যন্ত মজবুত। ব্যোমকেশ চাবি ঘুরাইয়া জোড়া কবাট খুলিয়া ফেলিল। আমি এবং নৃপেন সাগ্রহে ভিতরে উঁকি মারিলাম।

ভিতরে চারিটি থাক। সর্বোচ্চ থাকের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক সারি বই; মাঝে মাঝে ভাঙা দাঁতের মত ফাঁক পড়িয়াছে। কয়েকটি বইয়ের পিঠে সোনার জলে নাম লেখা—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মহাজন পদাবলী। ব্যোমকেশ আরও কয়েকখানি বই বাহির করিয়া দেখিল, অধিকাংশই বটতলার বই, কিন্তু বাঁধাই ভাল। হয়তো প্রভাত বাঁধিয়া দিয়াছে।

ব্যোমকেশ নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি হালদার কি খুব বই পড়ত?'

নৃপেন শুষ্কস্বরে বলিল, 'কোনওদিন পড়তে দেখিনি।'

'বাড়িতে আর কেউ বই পড়ে ?'

'প্রভাতবাবু পড়েন। আমিও পেলে পড়ি। কিন্তু কর্তার আলমারিতে যে বই আছে, তা আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

'অথচ বইয়ের সারিতে ফাঁক দেখে মনে হচ্ছে কয়েকখানা বই বার করা হয়েছে। কোথায় গেল বইগুলো ?

নৃপেন ঘরের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তা তো বলতে পারি না। এঘরে দেখছি না। প্রভাতবাবুকে জিগ্যেস করব ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন থাক, এমন কিছু জরুরী কথা নয়। —আচ্ছা, বাইরে অনাদি হালদারের কোথায় বেশী যাতায়াত ছিল ?'

নৃপেন বলিল, 'কর্তা বাড়ি থেকে বড় একটা বেরুতেন না। যখন বেরুতেন, হয় সলিসিটারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, নয়তো ব্যাঙ্কে যেতেন। এ ছাড়া আর বড় কোথাও যাতায়াত ছিল না।'

ব্যোমকেশ দ্বিতীয় থাকের প্রতি দৃষ্টি নামাইল।

দ্বিতীয় থাকে অনেকগুলি শিশি-বোতল রহিয়াছে। শিশিগুলি পেটেন্ট ঔষধের, বোতলগুলি বিলাতী মদ্যের। একটি বোতলের মদ্য প্রায় তলায় গিয়া ঠেকিয়াছে, অন্যগুলি শিল করা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদার মদ খেত ?'

নৃপেন বলিল,—'মাতাল ছিলেন না। তবে খেতেন। মাঝে মধ্যে গন্ধ পেয়েছি।

ঔষধের শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল অধিকাংশই টনিক জাতীয় ঔষধ, অতীত যৌবনকে পুনরুদ্ধার করিবার বিলাতী মুষ্টিযোগ। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরুনোর অভ্যেস অনাদি হালদারের ছিল না ?'

নৃপেন বলিল, 'খুব বেশী নয়, মাসে দু'-তিন দিন বেরুতেন।'

'বাঃ। অনাদি হালদারের গোটা চরিত্রটি বেশ পষ্ট হয়ে উঠছে। খাসা চরিত্র!' ব্যোমকেশ আলমারীর তৃতীয় থাকে মন দিল।

তৃতীয় থাকে অনেকগুলি মোটা মোটা খাতা এবং কয়েকটি ফাইল। খাতাগুলি কার্ডবোর্ড দিয়া মজবুত করিয়া বাঁধানো। খুলিয়া দেখা গেল ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবের খাতা। ব্যবসায়ের রীতি-প্রকৃতি জানিতে হইলে খাতাগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করা প্রয়োজন; কিন্তু তাহার সময় নাই। ব্যোমকেশ নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি হালদার কিসের ব্যবসা করত আপনি জানেন?'

নৃপেন বলিল, 'আগে কি ব্যবসা করতেন জানি না, উনি নিজের কথা কাউকে বলতেন না। তবে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জাপানী মাল কিনেছিলেন। কটন মিলে যেসব কলকব্জা লাগে, তাই। সস্তায় কিনেছিলেন—'

'তারপর কালাবাজারের দরে বিক্রি করেছিলেন। বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একখানা ফাইল তুলিয়া লইয়া মলাট খুলিয়া ধরিল।

ফাইলে নানা জাতীয় দলিলপত্র রহিয়াছে। নূতন বাড়ির ইস্টাম্বর দস্তাবেজ, সলিসিটারের চিঠি, বাড়িভাড়ার রসিদ ইত্যাদি। কাগজপত্রের উপর লঘুভাবে চোখ বুলাইতে বুলাইতে ব্যোমকেশ পাতা উল্টাইতে লাগিল, তারপর এক জায়গায় আসিয়া থামিল। একটি রুলটানা কাগজে কয়েক ছত্র লেখা, নীচে স্ট্যাম্পের উপর দস্তখৎ।

কাগজখানা ব্যোমকেশ ফাইল হইতে বাহির করিয়া লইল, মুখের কাছে তুলিয়া মনোযোগসহকারে পড়িতে লাগিল। আমি

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটি হ্যাণ্ড-নোট। অনাদি হালদার হাতচিঠির উপর দয়ালহরি মজুমদার নামক এক ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়াছে।

ব্যোমকেশ হ্যাণ্ডনোট হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, 'দয়ালহরি মজুমদার কে ?'

নৃপেন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'দয়ালহরি—ও, মনে পড়েছে—' একটু কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল, —'দয়ালহরিবাবুর মেয়েকে প্রভাতবাবু বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তারপর কর্তা মেয়ে দেখে অপছন্দ করেন—'

'মেয়ে বুঝি কুচ্ছিৎ ?'

'আমরা কেউ দেখিনি।'

'কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা ধার দেওয়ার মানে কি ?'

'জানি না ; হয়তো ওই জন্যেই—'

'ওই জন্যেই কী ?'

'হয়তো—যাকে টাকা ধার দিয়েছেন, তার মেয়ের সঙ্গে কর্তা প্রভাতবাবুর বিয়ে দিতে চান নি।'

'হতে পারে। অনাদি হালদার কি তেজারতির কারবার করত ?'

'না। তাঁকে কখনও টাকা ধার দিতে দেখিনি।

'হ্যাণ্ডনোটে তারিখ দেখছি ১১।৯।১৯৪৬, অর্থাৎ মাসখানেক আগেকার। অনাদি হালদার মেয়ে দেখতে গিয়েছিল কবে ?'

'প্রায় ওই সময়। তারিখ মনে নেই।'

'দয়ালহরি মজুমদার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন ?'

'কিচ্ছু না। বাইরে শুনেছি মেয়েটি নাকি খুব ভাল গাইতে পারে, এরি মধ্যে খুব নাম করেছে। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে।'

'তাই নাকি। অজিত, দয়ালহরি মজুমদারের ঠিকানাটা মনে করে রাখ তো—' হাতচিঠি দেখিয়া পড়িল—১৩।৩, রামতনু লেন শ্যামবাজার।'

মনে মনে ঠিকানাটা কয়েকবার আবৃত্তি করিয়া লইলাম। ব্যোমকেশ আলমারির নিম্নতম থাকটি তদারক করিতে আরম্ভ করিল।

নীচের থাকে কেবল একটি কাঠের হাত-বাক্স আছে, আর কিছু নাই। হাত বাক্সের গায় চাবি লাগানো। ব্যোমকেশ চাবি ঘুরাইয়া ডালা তুলিল। ভিতরে একগোছা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরা টাকা-পয়সা এবং একটি চেক বহি।

ব্যোমকেশ নোটগুলি গণিয়া দেখিল। দুইশত ষাট টাকা। চেক বহিখানি বেশ পুরু, একশত চেকের বহি; তাহার মধ্যে অর্ধেকের অধিক খরচ হইয়াছে। ব্যোমকেশ ব্যবহৃত চেকের অর্ধাংশগুলি উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে প্রশ্ন করিল, 'ভারত ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কোনও ব্যাঙ্কে অনাদি হালদার টাকা রাখত?'

নৃপেন বলিল, 'তিনি কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন তা আমি জানি না।'

'আশ্চর্য! নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, কনট্রাক্টরকে টাকা দিত কি করে?'

'ক্যাশ দিতেন। আমি জানি, কারণ আমি রসিদের খসড়া তৈরি করে কনট্রাক্টরকে দিয়ে সই করিয়ে নিতাম। যেদিন টাকা দেবার কথা, সেদিন বেলা ন'টার সময় কর্তা বেরিয়ে যেতেন, এগারটার সময় ফিরে আসতেন। তারপর কনট্রাক্টরকে টাকা দিতেন।'

'অর্থাৎ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে যেতেন?'

'আমার তাই মনে হয়।'

'হুঁ। বাড়ির দরুণ কনট্রাক্টরকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, আপনি জানেন?'

নৃপেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, 'প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রসিদগুলো বোধ হয় ফাইলে আছে। যদি জানতে চান—'

ব্যোমকেশ চেক-বহি রাখিয়া দিয়া অর্ধ-স্বগত বলিল, 'ভারি আশ্চর্য!—না, চুলচেরা হিসেব দরকার নেই। চল অজিত, এ ঘরে দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখা হয়েছে।' বলিয়া সযত্নে আলমারি বন্ধ করিল।

এই সময় ননীবালা একটি বড় থালার উপর চার পেয়ালা চা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন,—'এই নিন।—প্রভাত নিজের ঘরে শুয়ে আছে; তার চা দিয়ে এসেছি।'

নৃপেন আলো নিভাইয়া দিল। জানালা দিয়া দেখা গেল বাহিরে বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আমরা তিনজনে চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিলাম, কেষ্টবাবুর চায়ের পেয়ালা থালার উপর লইয়া ননীবালা আমাদের সঙ্গে আসিলেন।

বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া কেষ্টবাবু ঘুমাইতেছেন। ঘর্ঘর শব্দে তাঁহার নাক ডাকিতেছে।

ব্যালকনিতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, অনাদি হালদারের মৃত মুখের উপর সকালের আলো পড়িয়াছে। মাছিরা গন্ধ পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে।

সাত

চা শেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়াছি, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের সমবেত শব্দ শোনা গেল। এতক্ষণে বুঝি পুলিশ আসিতেছে।

কিন্তু আমার অনুমান ভুল, পুলিশের এখনও ঘুম ভাঙে নাই। যাঁহারা প্রবেশ করিলেন তাঁহারা সংখ্যায় তিনজন ; একটি অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সঙ্গে নিমাই ও নিতাই। ভাগাড়ে মড়া পড়িলে বহু দূরে থাকিয়াও যেমন শকুনির টনক নড়ে, নিমাই ও নিতাই তেমনি খুল্লতাতের মহাপ্রস্থানের গন্ধ পাইয়াছে।

পায়ের শব্দে কেষ্টবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, তিনি চোখ রগ্‌ড়াইয়া উঠিয়া বসিলেন। ভিতর দিক হইতে প্রভাতও প্রবেশ করিল।

প্রথমে দুই পক্ষ নির্বাকভাবে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। নিমাই ও নিতাই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দুই পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের চক্ষু একে একে আমাদের পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া গেল ; দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। বোধহয় তাহারা ব্যোমকেশকে চিনিতে পারিয়াছে।

প্রথমে ব্যোমকেশ কথা বলিল, 'আপনারা কি চান ?'

নিমাই ও নিতাই অমনি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দুই কানে ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া কথা বলিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ক্ষৌরিত মুখে কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁফ কণ্টকিত হইয়া ছিল ; অসময়ে ঘুম ভাঙানোর ফলে মেজাজও বোধকরি প্রসন্ন ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে ব্যোমকেশকে নবীক্ষণ করিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন, 'আপনি কে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

তিনজনের চোখেই চকিত সতর্কতা দেখা দিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু দম লইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'ডিটেক্‌টিভ্?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যান্বেষী।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলার মধ্যে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিলেন, তারপর প্রভাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমরা খবর পেয়েছি অনাদি হালদার মশায়ের মৃত্যু হয়েছে। এরা দুই ভাই নিমাই এবং নিতাই হালদার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। এঁরা মৃতের সম্পত্তি দখল নিতে এসেছেন। এ বাড়ি আপনাদের ছেড়ে দিতে হবে।'

প্রভাত কিছুক্ষণ অবুঝের মত চাহিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি? বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে! কিন্তু আপনি কে তা তো জানা গেল না।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, 'আমি এঁদের উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উকিল। তাহলে আপনার জানা উচিত যে অনাদি হালদারের ভাইপোরা তাঁর উত্তরাধিকারী নয়। তিনি পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন।'

উকিল কামিনীকান্ত নাকের মধ্যে একটি শব্দ করিলেন, ব্যোমকেশকে নিরতিশয় অবজ্ঞার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আপনি যখন পারিবারিক বন্ধু আপনার জানা উচিত যে অনাদি হালদার মশায় পোষ্যপুত্র নেননি। মুখের কথায় পোষ্যপুত্র নেওয়া যায় না। দলিল রেজিস্ট্রি করতে হয়, যাগযজ্ঞ করতে হয়। অনাদি হালদার মশায় এসব কিছুই করেননি।—আপনাদের এক বস্ত্রে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, একটা কুটা নিয়ে যেতে

পাবেন না। এখানে যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মক্কেলদের সম্পত্তি।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকালের জন্য যেন হতভম্ব হইয়া প্রভাতের পানে তাকাইল; তারপর সে সামলাইয়া লইল। মুখে একটা বঙ্কিম হাসি আনিয়া বলিল, 'বটে? ভেবেছেন হুম্‌কি দিয়ে অনাদি হালদারের সম্পত্তিটা দখল করবেন। অত সহজে সম্পত্তি দখল করা যায় না উকিলবাবু। পোষ্যপুত্র নেয়া যে আইনসঙ্গত নয় সেটা আদালতে প্রমাণ করতে হবে, সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট নিতে হবে, তবে দখল পাবেন। বুঝেছেন?'

উকিলবাবু বলিলেন, 'আপনারা যদি এই দণ্ডে বাড়ি ছেড়ে না যান, আমি পুলিশ ডাকব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিশ ডাকবার দরকার নেই, পুলিস নিজেই এল বলে।—ভাল কথা, অনাদিবাবু যে মারা গেছেন এটা আপনারা এত শিগ্‌গির জানলেন কি করে? এখনও দু'ঘণ্টা হয়নি—'

হঠাৎ নিমাই নিতাইয়ের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, দু'ঘণ্টা! কাকা মারা গেছেন রাত্তির এগারোটার সময়—' বলিয়াই অর্ধপথে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ মধুর স্বরে বলিল, 'এগারোটার সময় মারা গেছেন? আপনি জানলেন কি করে? মৃত্যুকালে আপনি উপস্থিত ছিলেন বুঝি? হাতে বন্দুক ছিল?'

নিমাই নিতাই একেবারে নীল হইয়া গেল। উকিলবাবু নিমাই (কিম্বা নিতাই)কে ধমক দিয়া বলিলেন, 'তোমরা চুপ করে থাকো, বলাকওয়া আমি করব। আপনারা তাহলে দখল ছাড়বেন না। আচ্ছা, আদালত থেকেই ব্যবস্থা হবে।' বলিয়া তিনি মক্কেলদের বাহু ধরিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চললেন? আর একটু সবুর করবেন না? পুলিশ এসে ভাইপোদের বয়ান নিশ্চয় শুনতে চাইবে। আপনারা কাল রাত্রি এগারোটার সময় কোথায় ছিলেন—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ভ্রাতুষ্পুত্রযুগল উকিলকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া অন্তর্হিত হইল। উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী ব্যোমকেশের প্রতি একটি গরল-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের অনুগমন করিলেন।

তাহাদের পদশব্দ নীচে মিলাইয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ প্রভাতের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি যে আইনত অনাদিবাবুর পোষ্যপুত্তুর নয় একথা আগে আমাকে বলেন নি কেন?'

প্রভাত ক্ষুব্ধ মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। এইবার ননীবালা দেবী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যেন চুপ্‌সিয়া গিয়াছে, চোখে ড্যাব্‌-ডেবে ব্যাকুলতা। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, ওরা যা বলে গেল তা কি সত্যি? প্রভাত অনাদিবাবুর পুষ্যিপুত্তুর নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সেই কথাই তো জানতে চাইছি।—প্রভাতবাবু—?'

প্রভাত ঠোঁট চাটিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'আমি—আইন জানি না। প্রথমে কলকাতায় আসবার পর অনাদিবাবু আমাকে নিয়ে সলিসিটরের অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে শুনেছিলাম, পুষ্যিপুত্তুর নিতে হলে দলিল রেজেস্ট্রি করতে হয়, হোম-যজ্ঞ করতে হয়। কিন্তু সে সব কিছু হয়নি।'

'তাহলে আপনি জানতেন যে আপনি অনাদিবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়?'

'হ্যাঁ, জানতাম। কিন্তু ভেবেছিলাম—'

'ভেবেছিলেন মৃত্যুর আগে অনাদিবাবু দলিল রেজিষ্ট্রি করে আপনাকে পুষ্যিপুত্তুর করে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর ননীবালা দীর্ঘকম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'তাহলে—তাহলে—প্রভাত কিছুই পাবে না। সব ওই নিমাই নিতাই পাবে!'—ননীবালার বিপুল দেহ যেন সহসা শিথিল হইয়া গেল, তিনি মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন।

প্রভাত ত্বরিতে গিয়া ননীবালার পাশে বসিল, গাঢ় হ্রস্ব স্বরে বলিল, 'তুমি ভাবছ কেন মা! দোকান তো আছে। তাতেই আমাদের দু'জনের চলে যাবে।'

ননীবালা প্রভাতেব গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। যাহোক তবু অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর একজনকে কাঁদিতে দেখা গেল।

ব্যোমকেশ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিবাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'নৃপেনবাবু কোথায়?'

এতক্ষণ নৃপেনের দিকে কাহারও নজর ছিল না, সে আবার নিঃসাড়ে অদৃশ্য হইয়াছে।

ব্যোমকেশ আমাকে চোখের ইশারা করিল। আমি নৃপেনের ঘরের দিকে পা বাড়াইয়াছি এমন সময় সে নিজেই ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'এই যে আমি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমি—একবার ছাতে গিয়েছিলাম।' নৃপেনের মুখ দেখিয়া মনে হয় সে কোনও কারণে নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ছাতে! তেতলার ছাতে?'

'না, দোতলাতেই ছাত আছে।'

'তাই নাকি? চলুন তো দেখি কেমন ছাত।'

যে গলি দিয়া নৃপেনের ঘরে যাইবার রাস্তা তাহারই শেষ প্রান্তে একটি দ্বার; দ্বারের ওপারে ছাদ। আলিসা দিয়া ঘেরা দাবার ছকের মত একটু স্থান। পিছনদিকে অন্য একটি বাড়ির দেয়াল, পাশে গলির পরপারে অনাদি হালদারের নূতন বাড়ি।

ছাতে দাঁড়াইয়া নূতন বাড়ির কাঠামো স্পষ্ট দেখা যায়, এমন কি দীর্ঘ-লম্ফের অভ্যাস থাকিলে এ বাড়ি হইতে ও বাড়িতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। নূতন বাড়ির দেয়াল দোতলার ছাত পর্যন্ত উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ভারা বাঁধা।

আলিসার ধারে ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'ছাতের দরজা রাত্তিরে খোলা থাকে?'

নৃপেন বলিল, 'খোলা থাকবার কথা নয়, কর্তা রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করতেন।

'কাল রাত্রে বন্ধ ছিল?'

'তা জানি না।'

'আপনি খানিক আগে যখন এসেছিলেন তখন খোলা ছিল না বন্ধ ছিল?'

নৃপেন আকাশের দিকে তাকাইয়া গলা চুলকাইল, শেষে বলিল, 'কি জানি, মনে করতে পারছি না। মনটা অন্যদিকে ছিল—'

'হুঁ।'

আমরা ঘরে ফিরিয়া গেলাম। ননীবালা দেবী তখনও সর্বহারা ভঙ্গীতে মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, প্রভাত মৃদুকণ্ঠে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। কেষ্টবাবু বিলম্বিত চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিতেছেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসের এখনও দেখা নেই। আমরা

এবার যাই। —এস অজিত, যাবার আগে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দেওয়া দরকার, নইলে পুলিস এসে হাঙ্গামা করতে পারে।'

ব্যাল্‌কনিতে গেলাম। মাছিরা দেহটাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। ব্যোমকেশ নত হইয়া চাবিটা মৃতের কোমরে ঘুন্‌সিতে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'ওহে অজিত, ছাখো।'

আমি ঝুঁকিয়া দেখিলাম কোমরের সুতার কাছে একটা দাগ, আধুলির মত আয়তনের লাল্‌চে একটা দাগ, জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিসের দাগ?'

ব্যোমকেশ দাগের উপর আঙুল বুলাইয়া বলিল—'রঙের দাগ মনে হয় কিন্তু রক্ত নয়। জড়ুল।'

মৃতদেহ ঢাকা দিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল—'আমরা চললাম। পুলিশ এসে যা-যা প্রশ্ন করবে তার উত্তর দেবেন, বেশী কিছু বলতে যাবেন না। আমি যে আলমারি খুলে দেখেছি তা বলবার দরকার নেই। নিমাই নিতাই যদি আসে তাদের বাড়ি ঢুকতে দেবেন না।—কেষ্টবাবু, ও বেলা একবার আমাদের বাসায় যাবেন।'

কেষ্টবাবু ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইলেন। আমরা নীচে নামিয়া চলিলাম। সূর্য উঠিয়াছে, শহরের সোরগোল শুরু হইয়া গিয়াছে।

আট

নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম সিঁড়ির ঘরে বৃদ্ধ ষষ্ঠীবাবু থেলো হুঁকা হাতে বিচরণ করিতেছেন, আমাদের দেখিয়া বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিলেন। প্রথম দিন তাঁহার যে উগ্রমূর্তি দেখিয়াছিলাম এখন আর তাহা নাই, বরং বেশ একটু সাগ্রহ কৌতূহলের ব্যঞ্জনা তাহার তোবড়ানো মুখখানিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—'আপনার নাম ষষ্ঠীবাবু?'

তিনি সতর্কভাবে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিলেন—'হ্যাঁ। আপনি—আপনারা—?'

ব্যোমকেশ আত্ম-পরিচয় দিল না, সংক্ষেপে বলিল—'আর বলবেন না মশায়। অনাদি হালদারের কাছে টাকা পাওনা ছিল, তা দেখছি টাকাটা ডুবল। লোকটা মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয়।'

ষষ্ঠীবাবুর সন্দিগ্ধ সতর্কতা দূর হইল। তিনি পরম তৃপ্তমুখে বলিলেন—'শুনেছি। কাল রাত্তির থেকেই শুনছি!—কিসে মারা গেল?' শেষোক্ত প্রশ্ন তিনি গলা বাড়াইয়া প্রায় ব্যোমকেশের কানে কানে করিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল—'শোনেন নি? কেউ তাকে খুন করেছে।—আপনি তো কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসে ছিলেন শুনলাম—'

মুখে বিরক্তিসূচক চুমকুড়ি দিয়া ষষ্ঠীবাবু বলিলেন—'কি করি, পাড়ার ছোঁড়াগুলো ঠিক বাড়ির সামনেই বাজি পোড়াতে শুরু করল। ওই দেখুন না, কত তুবড়ির খোলা পড়ে রয়েছে। শুধু

কি তুবড়ি। চীনে পটকা দোদমার আওয়াজে কান ঝালাপালা। ভাবলাম ঘুম তো আর হবে না, বাজি পোড়ানোই দেখি।—তা কি করে খুন হল? ছোরা-ছুরি মেরেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল—'তাহলে আপনি সন্ধ্যের পর থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসে ছিলেন। সে সময়ে কেউ অনাদি হালদারের কাছে এসেছিল?'

'কেউ না। একেবারে রাত বারোটার পর ওই ছেলেটা আর তার মা এল, এসেই দোর ঠ্যাঙাতে শুরু করল। তারপর এল ন্যাপা। তারপর কেষ্ট দাস।'

'ইতিমধ্যে আর কেউ আসেনি?'

'বাড়িতে কেউ ঢোকেনি। তবে—অনাদি হালদারের একটা ভাইপোকে একবার ওদিকের ফুটপাথে হোটেলের সামনে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'তারপর আর দেখিনি। অন্তত এ বাড়িতে ঢোকেনি।'

'কটার সময় তাকে দেখেছিলেন?'

'তা কি খেয়াল করেছি। তবে গোড়ার দিকে, তখনও হোটেলের দোতলায় বাবুরা জানলার ধারে বসে পাশা খেলছিল। দশটা কি সাড়ে দশটা হবে।—আচ্ছা, কে মেরেছে কিছু জানা গেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করিল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করিল—অনাদি হালদারের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

ষষ্ঠীবাবু চমকিয়া উঠিলেন—'অ্যাঁ। সদ্ভাব—মানে—অসদ্ভাব ছিল না।'

'আপনি কাল রাত্রে ওপরে যাননি?'

'আমি! আমি ওপরে যাব। বেশ লোক তো আপনি?

মতলব কি আপনার?' ষষ্ঠীবাবু ক্রমশ তেরিয়া হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে আপনি জানেন না?'

'আমি কি জানি! যে খুন করেছে সে জানে, আমি কি জানি। আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! আমি বুড়ো মানুষ, কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, আমাকে ফাঁসাতে চান?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল—'আমি আপনাকে ফাঁসাতে চাই না, আপনি নিজেই নিজেকে ফাঁসাচ্ছেন। অনাদি হালদারের মৃত্যুতে এত খুশী হয়েছেন যে চেপে রাখতে পারছেন না।—চল অজিত, ওই হোটেলটাতে গিয়ে আর এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক।'

ষষ্ঠীবাবু থ হইয়া রহিলেন, আমরা ফুটপাথে নামিয়া আসিলাম। রাস্তার ওপারে হোটেলের মাথার উপর মস্ত পরিচয় ফলক—শ্রীকান্ত পান্থনিবাস। শ্রীকান্ত বোধ হয় হোটেলের মালিকের নাম। নীচের তলায় রেস্তোরাঁয় চা পিয়াসীর দল বসিয়া গিয়াছে, দ্বিতলে জানালার সারি, কয়েকটা খোলা। ব্যোমকেশ পথ পার হইবার জন্য পা বাড়াইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল—দাঁড়াও, গলির মধ্যেটা একবার দেখে যাই।'

'গলির মধ্যে কী দেখবে?'

'এসই না।'

অনাদি হালদারের বাসা ও নূতন বাড়ির মাঝখান দিয়া গলিতে প্রবেশ করিলাম। একেই গলিটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তার উপর নূতন বাড়ির স্খলিত বিক্ষিপ্ত ইট-সুরকি এবং ভারা বাঁধার খুঁটি মিলিয়া তাহাকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। ব্যোমকেশ মাটির দিকে নজর রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

গলিটি কানা গলি, বেশি দূর যায় নাই। তাহার শেষ পর্যন্ত গিয়া ব্যোমকেশ ফিরিল, আবার মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চলিতে

লাগিল। তারপর অনাদি হালদারের বাসার পাশে পৌঁছিয়া হঠাৎ অবনত হইয়া একটা কিছু তুলিয়া লইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি পেলে?'

সে মুঠি খুলিয়া দেখাইল, একটি চকচকে নূতন চাবি। বলিলাম—'চাবি! কোথাকার চাবি?'

ব্যোমকেশ একবার ঊর্দ্ধে জানালার দিকে চাহিল, চাবিটি পকেটে রাখিয়া বলিল—হলফ নিয়ে বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয় অনাদি হালদারের আলমারির চাবি।'

'কিন্তু—'

'আন্দাজ করেছিলাম গলির মধ্যে কিছু পাওয়া যাবে। এখন চল, চা খাওয়া যাক।'

'কিন্তু—আলমারির চাবি তো—'

'অনাদি হালদারের কোমরে আছে। তা আছে। কিন্তু আর একটা চাবি থাকতে বাধা কি?'

'কিন্তু—গলিতে চাবি এল কি করে?'

'জানলা দিয়ে।—এস।' ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

শ্রীকান্ত পান্থনিবাসে প্রবেশ করিয়া একটি টেবিলে বসিলাম। ভৃত্য চা ও বিস্কুট দিয়া গেল। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল হোটেলের মালিক শ্রীকান্ত গোস্বামী পাশেই একটি ঘরে আছেন। চা বিস্কুট সমাপ্ত করিয়া আমরা নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিলাম।

ঘরটি শ্রীকান্তবাবুর অফিস; মাঝখানে টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। শ্রীকান্তবাবু মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, চেহারা গোলগাল, মুণ্ডিত মুখ; বৈষ্ণবোচিত প্রশান্ত ভাব। তিনি গত রাত্রির বাসি ফাউল কাটলেট সহযোগে চা খাইতেছিলেন, আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

ব্যোমকেশ সবিনয়ে বলিল—'মাফ করবেন, আপনিই কি হোটেলের মালিক শ্রীকান্ত গোস্বামী মশায় ?'

গোস্বামী মহাশয়ের মুখ ফাউল কাটলেটে ভরা ছিল, তিনি এক চুমুক চা খাইয়া কোনও মতে তাহা গলাধঃকরণ করিলেন, বলিলেন—'আসুন। আপনারা—?'

ব্যোমকেশ বলিল—'একটু দরকারে এসেছি। সামনের বাড়িতে কাল রাত্রে খুন হয়ে গেছে শুনেছেন বোধ হয় ?'

'খুন !' শ্রীকান্তবাবু ফাউল কাটলেটের প্লেট পাশে সরাইয়া দিলেন—'কে খুন হয়েছে ?'

'১৭২।২ নম্বর বাড়িতে থাকত—অনাদি হালদার।'

শ্রীকান্তবাবু চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন—'অনাদি হালদার খুন হয়েছে ! বলেন কি।'

'তাকে আপনি চিনতেন ?'

'চিনতাম বৈকি। সামনের বাড়ির দোতলায় থাকত, নতুন বাড়ি তুলছিল। প্রায়ই আমার হোটেলে এসে চপ্ কাট্‌লেট খেত।—কাল রাত্তিরেও যে তাকে দেখেছি।'

'তাই নাকি ! কোথায় দেখলেন ?'

'ওর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তার বাজি পোড়ানো দেখছিল। যখনই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কখন কোথা থেকে কি দেখলেন সব কথা দয়া করে বলুন। আমি অনাদি হালদারের খুনের তদন্ত করছি। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

শ্রীকান্ত বিস্ময়াপ্লুত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'আপনি ব্যোমকেশবাবু ! কি সৌভাগ্য।' তিনি ভৃত্য ডাকিয়া আমাদের জন্য চা ও ফাউল কাটলেট হুকুম দিলেন। আমরা

এইমাত্র চা বিস্কুট খাইয়াছি বলিয়াও পরিত্রাণ পাওয়া গেল না।

তারপর শ্রীকান্তবাবু বলিলেন—'আমার হোটেলের দোতলায় দুটো ঘর নিয়ে আমি থাকি, বাকি তিনটে ঘর কয়েকজন ভদ্রলোক মেস করে আছেন। সবশুদ্ধ এগারজন। তার মধ্যে তিনজন কালীপুজোর ছুটিতে দেশে গেছেন, বাকি আটজন বাসাতেই আছেন। কাল সন্ধ্যের পর ১ নম্বর আর ৩ নম্বর ঘরের বাবুরা ঘরে তালা দিয়ে শহরে আলো দেখতে বেরুলেন। ২ নম্বর ঘরের যামিনীবাবুরা তিন জন বাসাতেই রইলেন। ওঁদের খুব পাশা খেলার শখ। আমিও খেলি। কাল সন্ধ্যে সাতটার পর ওঁরা আমাকে ডাকলেন, আমরা চার জন যামিনীবাবুর তক্তাপোশে পাশা খেলতে বসলাম। যামিনীবাবুর তক্তাপোশ ঠিক রাস্তার ধারে জানলার সামনে। সেখানে বসে খেলতে খেলতে যখনই বাইরের দিকে চোখ গেছে তখনই দেখেছি অনাদি হালদার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে। আমরা তিন দান খেলেছিলাম, প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেলা চলেছিল।'

'তারপর আর অনাদি হালদারকে দেখেন নি?'

'না, তারপর আমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম, অনাদি হালদারকে আর দেখিনি।'

'যে বাবুরা আলো দেখতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা কখন ফিরলেন?'

'তাঁদের মধ্যে দু'জন ফিরেছিলেন রাত বারোটার সময়, বাকি বাবুরা এখন ফেরেননি।'

'এখনও আলো দেখছেন!'

শ্রীকান্তবাবু অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; মনুষ্য জাতির ধাতুগত দুর্বলতা সম্বন্ধে বোধ করি নীরবে খেদ প্রকাশ করিলেন।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কাট্‌লেট চিবাইল, তারপর বলিল—'দেখুন, অনাদি হালদারের লাস পাওয়া গেছে ওই ব্যাল্‌কনিতেই, বুকে বন্দুকের গুলী লেগে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে আপনার হোটেল থেকে কেউ বন্দুক ছুঁড়ে অনাদি হালদারকে মেরেছে—'

শ্রীকান্তবাবু আবার চক্ষু কপালে তুলিলেন—'আমার হোটেল থেকে! সে কি কথা! কে মারবে?'

ব্যোমকেশ বলিল—'এটা আন্দাজ মাত্র। আপনি বলছেন সন্ধ্যে সাতটা থেকে আপনারা চার জন ছাড়া দোতলায় আর কেউ ছিল না। এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন—'মেসের বাসিন্দা আর কেউ ছিল না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবে—দাঁড়ান। একটা চাকর দোতলার কাজকর্ম করে, সে বলতে পারবে।—হরিশ! ওরে কে আছিস হরিশকে ডেকে দে।'

কিছুক্ষণ পরে হরিশ আসিল, ছিটের ফতুয়া পরা আধ-বয়সী লোক। শ্রীকান্তবাবু বলিলেন—'কাল সন্ধ্যে থেকে তুই কোথায় ছিলি?'

হরিশ বলিল—'আজ্ঞে ওপরেই তো ছিলুম বাবু, সারাক্ষণ সিঁড়ির গোড়ায় বসেছিলুম। আপনারা শতরঞ্চি খেলতে বসলেন—'

'কতক্ষণ পর্যন্ত ছিলি?'

'আজ্ঞে রাত দুপুরে ধীরুবাবু আর মানিকবাবু ফিরলেন, তখন আমি সিঁড়ির পাশেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়লুম। কোথাও তো যাইনি বাবু।'

শ্রীকান্তবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকাইলেন, ব্যোমকেশ হরিশকে প্রশ্ন করিল—'বাবুরা পাশা খেলতে আরম্ভ করবার পর থেকে

রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তুমি সারাক্ষণ সিঁড়ির কাছে বসেছিলে, একবারও কোথায় যাওনি ?'

হরিশ বলিল—'একবারটি পাঁচ মিনিটের জন্যে নীচে গেছলুম যামিনীবাবুর জন্যে দোক্তা আনতে।'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যামিনীবাবু ওকে একবার দোক্তা আনতে পাঠিয়েছিলেন বটে।'

'সে কখন ? ক'টার সময় ?'

'আজ্ঞে রাত্তির তখন ন'টা হবে।'

'হুঁ। রাত্রি নটা থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত দোতলায় কেউ আসেনি ?'

'দোতলায় কেউ আসেনি বাবু। দশটা নাগাদ তেতলার ভাড়াটে বাবু এসেছিলেন, কিন্তু তিনি দোতলায় দাঁড়াননি, সটান তেতলায় উঠে গেছলেন।'

ব্যোমকেশ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীকান্তবাবুর পানে চাহিল। তিনি বলিলেন—'ওহো, তেতলার ভাড়াটের কথা বলা হয়নি। তেতলায় একটা ছোট ঘর আছে, চিলেকোঠা বলতে পারেন। এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন। ঘরে পাকাপাকি থাকেন না, খাওয়া-দাওয়াও করেন না। তবে রোজ সকাল-বিকেল আসেন, ঘরের মধ্যে দোর বন্ধ করে কি করেন জানি না, তারপর আবার তালা লাগিয়ে চলে যান। একটু অদ্ভুত ধরনের লোক।'

'নাম কি ভদ্রলোকের ?'

'নাম ? দাঁড়ান বলছি—' শ্রীকান্তবাবু একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া দেখিলেন—'নিত্যানন্দ ঘোষাল।'

'নিত্যানন্দ ঘোষাল !' ব্যোমকেশ একবার আড়চোখে আমার পানে চাহিল—'রোজ দু'বেলা যখন আসেন তখন কলকাতার লোক বলেই মনে হচ্ছে। কতদিন আছেন এখানে ?'

'প্রায় ছ' মাস। নিয়মিত ভাড়া দেন, কোনও হাঙ্গামা নেই।'

'কি রকম চেহারা বলুন তো?'

'মোটাসোটা গোলগাল।'

ব্যোমকেশ আবার আমার পানে কটাক্ষপাত করিয়া মুচকি হাসিল—'চেনা-চেনা ঠেকছে—' হরিশকে বলিল—'নিত্যানন্দবাবু দশটা নাগাদ এসেছিলেন? তোমার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল?'

হরিশ বলিল—'আজ্ঞে না, উনি কথাবার্তা বলেন না। ব্যাগ হাতে সটান তেতলায় উঠে গেলেন।'

'ব্যাগ!'

'আজ্ঞে। উনি যখনই আসেন সঙ্গে চামড়ার ব্যাগ থাকে।'

'তাই নাকি! কত বড় ব্যাগ?'

'আজ্ঞে লম্বা গোছের ব্যাগ; সানাইবাঁশী রাখার ব্যাগের মত।'

'ক্ল্যারিওনেট রাখার ব্যাগের মত? ভদ্রলোক তেতলার ঘরে নিরিবিলি বাঁশী বাজানো অভ্যেস করতে আসেন নাকি?'

'আজ্ঞে কোনও দিন বাজাতে শুনিনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—'কাল রাত্রে উনি কখন ফিরে গেলেন?'

'ঘণ্টাখানেক পরেই। খুব ব্যস্তসমস্তভাবে তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।'

'ও!—আচ্ছা তুমি এবার যেতে পারো।' হরিশ শূন্য পেয়ালা প্লেট প্রভৃতি লইয়া প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ শ্রীকান্তবাবুকে বলিল—'ওপরতলাগুলো একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপত্তি আছে কি?'

'বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের? আসুন।' শ্রীকান্তবাবু আমাদের উপর তলায় লইয়া চলিলেন।

দ্বিতলে পাশাপাশি পাঁচটি বড় বড় ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই প্রথম দুটি ঘর শ্রীকান্তবাবুর। দ্বারে তালা লাগানো ছিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কি একলা থাকেন?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন—'আপাতত একলা। স্ত্রীকে ছেলে-পুলে নিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। যা দিনকাল।'

'বেশ করেছেন।'

এক নম্বর ঘরে তালা লাগানো, বাবুরা এখনও ফেরেন নাই। দু নম্বর ঘরে তিনটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রহিয়াছেন। একজন মেঝেয় বসিয়া জুতা পালিশ করিতেছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দাড়ি কামাইতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি খোলা জানালার ধারে বিছানায় কাত হইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। জানালা দিয়া রাস্তার ওপারে অনাদি হালদারের বাসা সোজাসোজি দেখা যাইতেছে। ব্যালকনির ভিতর দৃষ্টি প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঢালাই লোহার ঘন রেলিং-এর ভিতর দিয়া কিছু দেখা গেল না।

তিন নম্বর ঘরে ধীরুবাবু ও মাণিকবাবু সবেমাত্র বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন এবং তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছেন। শ্রীকান্তবাবু সহাস্যে বলিলেন—'কী, ঘুম ভাঙল?'

দুজনে বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া আড়ামোড়া ভাঙিলেন।

ব্যোমকেশ কাহাকেও কোনও প্রশ্ন করিল না, দ্বিতল পরিদর্শন করিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া চলিল। একই সিঁড়ি ত্রিতলে গিয়াছে, তাহা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শ্রীকান্তবাবু ও আমি পিছনে রহিলাম।

ত্রিতলে একটি ঘর, বাকি ছাদ খোলা। ঘরের দরজায় তালা লাগানো।

ব্যোমকেশ শ্রীকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার কাছে চাবি আছে নাকি?'

'না। তবে—' তিনি পকেট হইতে চাবির একটা গোছা বাহির করিয়া বলিলেন—'দেখুন যদি কোনও চাবি লাগে। ভাড়াটের অবর্তমানে তার ঘর খোলা বোধ হয় উচিত নয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—'

চাবির গোছা লইয়া ব্যোমকেশ কয়েকটা চাবি লাগাইয়া দেখিল। সস্তা তালা, বেশী চেষ্টা করিতে হইল না, খুট করিয়া খুলিয়া গেল।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের একটিমাত্র জানালা রাস্তার দিকে খোলা রহিয়াছে। আসবাবের মধ্যে একটি উলঙ্গ তক্তাপোশ ও একটি লোহার চেয়ার। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশ কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া প্রথমেই জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নীচে প্রশস্ত রাস্তার উপর মানুষ ও যানবাহনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। ওপারে অন্যান্য বাড়ির সারির মধ্যে অনাদি হালদারের ব্যাল্‌কনি।

ব্যোমকেশ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া কতকটা আপন মনেই বলিল—'কাল রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময়······রাস্তায় ছেলেরা বাজি পোড়াচ্ছে······চারিদিকে দুমদাম শব্দ—অনাদি হালদার ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে······সেই সময় জানলা থেকে তাকে গুলী করা কি খুব শক্ত? গুলীর আওয়াজ শোনা গেলেও বোমা ফাটার আওয়াজ বলেই মনে হবে।'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন—'তা বটে। কিন্তু হোটেলে এত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দুক আনা কি সহজ?'

'আপনার ভাড়াটে হাতে ব্যাগ নিয়ে হোটেলে আসে। ব্যাগের মধ্যে একটা পিস্তল কিম্বা রিভলবার সহজেই আনা যায়।'

'কিন্তু রাইফেল কিম্বা বন্দুক আনা যায় কি? আমাকে মাফ করবেন, আমি অদ্বৈত বংশের সন্তান, গোলাগুলি বন্দুক পিস্তলের ব্যাপার কিছুই বুঝি না। তবু মনে হয়, পিস্তল কিংবা রিভলবার দিয়ে এতদূর থেকে মানুষ মারা সহজ কাজ নয়।'

উত্তরে ব্যোমকেশ কেবল গলার মধ্যে একটা শব্দ করিল। তারপর নিরাভরণ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল —'চলুন, যাওয়া যাক, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—' বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। দেখিলাম তাহার দৃষ্টি দেয়ালের একটা স্থানে আটকাইয়া গিয়াছে।

জানালার ঠিক উল্টা পিঠে দেয়ালের ছাদের কাছে খানিকটা চূণ বালি খসিয়া গিয়াছে। তাহার নীচে মেঝের উপর খসিয়া-পড়া চূণ-বালি পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ ত্বরিতে গিয়া চূণ-বালি পরীক্ষা করিল, বলিল—'নতুন খসেছে মনে হচ্ছে। শ্রীকান্তবাবু, এ ঘর রোজ ঝাঁটপাট দেওয়া হয়?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন—'না। ঘর খোলা থাকে না—'

'ব্যোমকেশ দু' পা সরিয়া আসিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল।

'দেয়ালের এই চূণ-বালি কবে খসেছে আপনি বলতে পারেন না?'

'না। এইটুকু বলতে পারি, ছ' মাস আগে যখন ঘর ভাড়া দিয়েছিলাম তখন প্ল্যাষ্টার ঠিক ছিল।'

'হুঁ। অজিত, চৌকিটা ধরতো, একবার দেখি—'

দু'জনে চৌকি ধরিয়া দেয়াল ঘেঁষিয়া রাখিলাম; তাহার উপর লোহার চেয়ার রাখিয়া ব্যোমকেশ তদুপরি আরোহণ করিল। সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া দেয়ালের ক্ষতস্থানটার নাগাল পাওয়া

যায়। ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া স্থানটা হাতড়াইল, তারপর একটি ক্ষুদ্র বস্তু হাতে লইয়া নামিয়া আসিল। পেন্সিলের ক্যাপের মত লম্বাটে আকৃতির একটি ধাতব পদার্থ, তাহার গায়ে রাইফেলের পেঁচানো রেখাচিহ্ন।

রাইফেলের টোটা। ব্যোমকেশ সেটি ঘুরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—'এ বস্তু এখানে এল কি করে? কবে এল। —ঘরের মধ্যে কেউ রাইফেল ছুঁড়েছিল? কিম্বা—' ব্যোমকেশ জানালার দিকে চাহিল—'অনাদি হালদার যদি ব্যালকনি থেকে জানলা লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়ে থাকে তাহলে গুলীটা দেয়ালের ওই জায়গায় লাগা সম্ভব। অথবা—'

নয়

বাসায় ফিরিতে দেরি হইল। রাত্রি সাড়ে তিনটা হইতে বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই।

ফিরিয়া আসিয়াই ব্যোমকেশ খবরের কাগজ লইয়া বসিয়া গেল। আমি কয়েকবার অনাদি-প্রসঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে গায়ে মাখিল না। একবার অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—'আকাশের গায় নাকি টকটক গন্ধ?'

আমি রাগ করিয়া নিরুত্তর হইলাম। কুক্ষণে খোকাকে একখানি আবোল-তাবোল কিনে দিয়েছিলাম। ব্যোমকেশ বইখানি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে এবং সময়ে অসময়ে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছে।

গত রাত্রে নিদ্রার ঘাটতি পড়িয়াছিল, দুপুর বেলা তাহা পূরণ করিয়া লইলাম। বৈকালে চা পান করিতে বসিয়া ব্যোমকেশ নিজেই কথা পাড়িল—'কেষ্টবাবুর এখনও দেখা নেই। মনে হচ্ছে সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে।'

বলিলাম—'কেষ্টবাবুর যখন গলায় কাঁটা বিঁধেছিল, তখন ছুটে এসেছিল। এখন বোধ হয় কাঁটা বেরিয়ে গেছে তাই গা-ঢাকা দিয়েছে।'

'তাই হবে। কিন্তু ওরা যদি না আসে, আমিই বা কি করতে পারি। কেসটা বেশ, রহস্যময়—'

'কে খুন করেছে এখনও বুঝতে পারনি?'

'উহুঁ। কিন্তু যেই করুক, খুব ভেবেচিন্তে, আটঘাট বেঁধে করেছে। কালীপুজোর রাত্তির, চতুর্দিকে বোমা ফাটার শব্দ—

তার মধ্যে একটি বন্দুকের আওয়াজ। প্ল্যান করে খুন না করলে এমন যোগাযোগ হয় না।'

'কে এমন প্ল্যান করতে পারে?'

'কে না করতে পারে। সকলেরই স্বার্থ রয়েছে, সকলেরই সুযোগ রয়েছে।'

'সকলে কারা?'

'একে একে ধর। প্রথমে ধর নিমাই নিতাই। খুড়ো পুষ্যিপুত্তুর নিলেই খুড়োর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়, অতএব খুড়োকে পুষ্যিপুত্তুর নেবার আগেই সরানো দরকার। নিমাই নিতাইয়েব মধ্যে একজন শ্রীকান্ত হোটেলের চূড়োয় আড্ডা গাড়ল, বন্দুক নিয়ে ওৎ পেতে রইল। কালীপুজোর রাত্রে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে বন্দুকের গুলী ছুটল। খুড়ো কুপোকাৎ। কাম ফতে।'

'তাহলে ভাইপো'রাই খুন করেছে, অন্য কারুর ওপর সন্দেহের কারণ নেই।'

'কারণ যথেষ্ট আছে। শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলার ঘরে রাইফেলের গুলী এল কোথা থেকে? ওই ঘর থেকে বন্দুক ছোঁড়া হয়েছিল, এটা একটা অনুমান বটে, কিন্তু অনিবার্য অনুমান নয়। ভেবে দেখ, অনাদি হালদার ব্যালকনিতে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার পেছনেই দরজা। পিছন থেকে গুঁড়ি মেরে এসে কেউ যদি তাকে গুলী করে, তাহলে গুলিটা তার শরীর ফুঁড়ে শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলার ঘরের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকবে এবং দেয়ালে আটকে যাবে।'

'সম্ভব বটে। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। অনাদি হালদারের বাসায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ ছিল। তাছাড়া আর একটা কথা, গুলীটা অনাদি হালদারের

বুকের দিক দিয়ে ঢুকে পিঠের দিক দিয়ে বেরিয়েছিল না পিঠের দিক দিয়ে ঢুকে বুকের দিক দিয়ে বেরিয়েছিল ?

'সেটা পোস্ট মর্টেম না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না। কিন্তু যেদিক দিয়েই গুলী ঢুকুক, ব্যালকনিতে গুলীটা পাওয়া যায়নি। তা থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, বাসার ভিতর দিক থেকেই অনাদি হালদারকে গুলী করা হয়েছে।'

'আচ্ছা, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক্ যে, বাসার ভিতর থেকেই কেউ গুলী চালিয়েছে। কিন্তু লোকটা কে ?'

'সেইটেই আসল প্রশ্ন। দেখা যাক কার স্বার্থ আছে। কেষ্ট দাসের কোনও স্বার্থ আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত এবং পাজি, হয়তো দোষ কাটাবার জন্যেই শেষ রাত্রে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। সুতরাং তাকেও বাদ দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় হলো ননীবালা দেবী।

'ননীবালা !'

'ননীবালা দেবীটি জবরদস্ত মহিলা। পালিত পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ খাঁটি মাতৃস্নেহের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তিনি জানতেন না যে, প্রভাতের পোষ্যপুত্র গ্রহণের ব্যাপারে আইনঘটিত খুঁত আছে। সুতরাং তিনি ভাবতে পারেন যে, অনাদি হালদারকে সরাতে পারলেই প্রভাত সম্পত্তি পাবে এবং তাকে মারবার চেষ্টা আর কেউ করবে না। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, ননীবালা যেদিন দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সেদিন আমি বলেছিলাম, অনাদি হালদারের মৃত্যুতে অনেকের সুবিধে হতে পারে। হয়তো সেই কথাটাই ননীবালার প্রাণে গেঁথে গিয়েছিল।'

'কিন্তু—মেয়েমানুষ বন্দুক চালাবে ?'

'কেন চালাবে না ? বন্দুক চালানোর মধ্যে শক্তটা কোন্‌খানে ?

হারমোনিয়ম যেমন টিপলেই সুর বেরোয়, বন্দুক তেমনি টিপলেই গুলী বেরোয়। ওর চেয়ে কুমড়ো-ছেঁচকি রাঁধা ঢের বেশী কঠিন কাজ।'

'কিন্তু ননীবালা তো জয় মা-কালী দেখছিলেন।'

'তিনি জয় মা-কালী দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সারাক্ষণ প্রেক্ষাগৃহে ছিলেন, তার প্রমাণ কৈ? তাঁর সঙ্গে পরিচিত কেউ ছিল না, হয়তো ছবি আরম্ভ হবার পর তিনি অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়েছিলেন, তারপর কাজকর্ম সেরে আবার গিয়ে বসেছিলেন।'

'তিনি বন্দুক কোথায় পেলেন?'

'হায় মূর্খ! বাটুল সর্দারের মত গণ্ডাগণ্ডা গুণ্ডা যেখানে চোরাই বন্দুক পাচার করবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সেখানে বন্দুকের অভাব? পাঁচ টাকা খরচ করলে বন্দুক ভাড়া পাওয়া যায়।'

'হুঁ। তারপর?'

'তারপর প্রভাত। প্রভাত অবশ্য জানত যে সে অনাদি হালদারের পুষ্যিপুত্তুর নয়, কিন্তু তার অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তার নিজস্ব দোকান আছে, অনাদি হালদার মরে গেলেও তার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। সে ভাবতে পারে অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর তার ভাইপো'রা আর তার কোনও অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে না। ভাইপোদের হাত থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই হয়তো সে অনাদি হালদারকে মেরেছে।'

'এটা খুব জোরালো মোটিভ তুমি মনে কর?'

'খুব জোরালো মোটিভ না হতে পারে, কিন্তু তিল কুড়িয়ে তাল হয়। প্রভাত একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল,

অনাদি হালদার সে সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। এটাও সামান্ত মোটিভ নয়।'

আমি হাসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল—'হেসো না। তোমার কাছে যা তুচ্ছ, অন্যের কাছে তা পর্বতপ্রমাণ হতে পারে। কখনও প্রেমে পড়নি, প্রেম কি বস্তু জান না। প্রেমের জন্যে মানুষ খুন করতে পারে, ফাঁসি যেতে পারে, সর্বস্ব খোয়াতে পারে—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, মেনে নিলাম প্রভাতও খুন করতে পারে।'

'তবে একটা কথা আছে। প্রভাত সারাক্ষণ তার দোকানে ছিল, দোকানের দরজায় গুর্খা দরোয়ান ছিল। তার এই অ্যালিবাই যদি পাকা হয়—'

'পাকা হওয়াই সম্ভব। প্রভাত এমন মিথ্যে কথা বলবে না, যা সহজেই ধরা যায়। তারপর বল।'

'তারপর ন্যাপা।' ব্যোমকেশ পকেট হইতে কুড়াইয়া পাওয়া চাবিটি বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল—'দুটো খবর নিশ্চয়ভাবে জানা দরকার: এটা অনাদি হালদারের চাবি কি না এবং এটা গলিতে কে ফেলেছিল।'

বলিলাম—'ন্যাপার ওপরই তোমার সন্দেহ, কেমন? মনে করা যাক, এটা অনাদি হালদারের আলমারির চাবি এবং ন্যাপা এটা গলিতে ফেলেছিল। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ হয়তো কিছুই হয় না, কিন্তু ন্যাপার ওপর সন্দেহ হয়। আলমারিতে হয়তো অনেক নগদ টাকা ছিল—'

এ আবার এক নূতন সম্ভাবনা। প্রশ্ন করিলাম—'দাঁড়ালো কি? আসামী কে? নিমাই নিতাই? কেষ্টবাবু? ননীবালা? প্রভাত? ন্যাপা? না আর কেউ?'

'আর একজন হতে পারে।'

'আবার কে ?'

'বাঁটুল সর্দার।'

'বাঁটুল—! সে কেন অনাদি হালদারকে খুন করবে ?'

'প্রাণরক্ষার ওজুহাতে চাঁদা আদায় করা বাঁটুলের পেশা। অনাদি হালদার চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছিল। তার দেখাদেখি যদি অন্য সকলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে ? তাই অনাদি হালদারকে শাস্তি দেওয়া দরকার, তার পরিণাম দেখে আর সকলে শায়েস্তা থাকবে।'

পুঁটিরাম আসিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—'বাঁশ বনে ডোম কানা। শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী কারে রেখে কারে ফেলি।

দুইজনে নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। ঘড়িতে যখন সওয়া চারটে, তখন দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল।

দ্বার খুলিয়া দেখিলাম কেষ্টবাবু। শেষ পর্যন্ত কেষ্টবাবু আসিয়াছেন। কিন্তু এ কেষ্টবাবু সকাল বেলার ভয়বিমূঢ় মন্ত্র-বিহ্বল কেষ্টবাবু নয়, চটপটে স্মার্ট কেষ্টবাবু। গায়ে ধোপদস্ত জামাকাপড়, দস্তুর মুখে আত্মপ্রসন্ন মৃদুমন্দ হাসি। মানুষটা যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে।

তিনি ব্যোমকেশের সম্মুখের চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন। ব্যোম-কেশ চাবিটি হাতে তুলিয়া ধরিয়া নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করিতেছিল, চোখ তুলিয়া বলিল—'খবর কি ? পুলিস এসেছিল ?'

কেষ্টবাবু চাবিটি দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে-চোখে কোনও প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পাইল না। প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুখে চটকার শব্দ করিয়া বলিলেন—'এগারোটার সময় এসেছিল। কী রামরাজত্বে বাস করছি আমরা।'

চাবি পকেটে রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'তারপর কি হল ?'

'কি আর হবে। দারোগা সকলকে হুমকি দিলে, অনাদির আলমারিটা খুলে দেখলে, একগোছা নোট ছিল পকেটে পুরলে তারপর লাস তুলে নিয়ে চলে গেল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল—'আপনাদের কাউকে কিছু জিগ্যেস করলে না?'

'কাল রাত্রে কে কোথায় ছিলাম, জিগ্যেস করেছিল, আর কিছু নয়। একছত্র লিখেও নিলে না। তুম তুম করে এল, তুম তুম করে চলে গেল।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'যাক, অনাদি হালদারের বেশ সদ্‌গতি হল। কে মেরেছে তা জানা যাবে না, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাবে কিনা, সন্দেহ। ভালই হল, আপনাদের ভুগতে হবে না।'

কেষ্টবাবু বলিলেন—'ভাল যাদের হবার তাদের হল, আমার আর কি ভাল হল ব্যোমকেশবাবু? আমাকে বেশিদিন ওখানে টিকতে হবেনা।'

'কেন?'

'ননীবালা পেছনে লেগেছে, আমাকে তাড়াতে চায়। এখন তো আর অনাদি নেই, মাগীর বিক্রম বেড়েছে। দেখুন না, বেরুবার সময় বললাম—এক পেয়ালা চা করে দেবে? তা মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল—চা-টা এখন হবে না, দোকানে গিয়ে চা খাওগে।'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'তাহলে আপনি এখন কি করবেন মনে করেছেন?'

কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কাজকর্ম তো আর এ-বয়সে পোষাবে না।' বলিয়া কেষ্টবাবু দুই সহস্র দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল—'আপনার বয়স এমন কী বেশি হয়েছে—কাজ করবার বয়স যায়নি।'

'কাজ করার অভ্যেস ছেড়ে গেছে ব্যোমকেশবাবু। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আচ্ছা, আজ উঠি তাহলে।' বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

'বসুন, বসুন, চা খেয়ে যান।'

কেষ্টবাবু আবার বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিয়া চা ও জলখাবার আনিতে বলিল।

কেষ্টবাবু হৃষ্টমুখে বলিলেন—'আপনি ভদ্রলোক, তাই দরদ বুঝলেন। সবাই কি বোঝে? দুনিয়া স্বার্থপর, গলা টিপে না ধরলে কেউ কিছু দেয় না। অনাদি যে আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে—' তিনি ব্যোমকেশের পানে আড়নয়নে চাইলেন—'চা খুবই ভাল জিনিস, তবে কি জানেন, আমার একটা বদ্‌অভ্যেস হয়ে গেছে, বিকেল বেলার দিকে শুধু চায়ে আর মৌতাত জমে না।' বলিয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাসিলেন।

ইঙ্গিতটা ব্যোমকেশ এড়াইয়া গেল। বলিল—'পুলিশ ছাড়া আর কেউ এসেছিল নাকি? নিমাই নিতাই—?'

কেষ্টবাবু বলিলেন—'নিমাই নিতাই আর আসেনি। তবে গুরুদত্ত সিং এসে খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে গেল।'

'গুরুদত্ত সিং—কণ্ট্র্যাক্টর -'

'হ্যাঁ। পুলিশ চলে যাবার পরই সে এসে হাজির। চেঁচাতে লাগল—আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজ করেছি, মোটে ত্রিশ হাজার পেয়েছি—আজ অনাদি হালদার দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল—সে মরে গেছে, এখন কে দেবে টাকা। আমি বলিলাম—বাপু, কে টাকা দেবে তা আমরা কি জানি। অনাদির ওয়ারিশের কাছে যাও, থানায় যাও, আদালতে যাও—এখান থেকে বিদেয় হও। যেতে কি চায়? অনেক কষ্টে বিদেয় করলাম।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল—'অনাদি হালদার কণ্ট্র্যাক্টরকে আজ দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল···কাল ছিল ব্যাঙ্ক-হলিডে, তার মানে পরশু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে রেখেছিল—অর্থাৎ—'

কেষ্টবাবু বলিলেন—'ব্যাঙ্ক থেকে ?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়া অত টাকা কোথা থেকে আসবে ?'

কেষ্টবাবু সুর পাল্টাইয়া বলিলেন—'তা তো বটেই। আমি ওসব কিছু জানি না। আদার ব্যাপারী—হ্যাঁ হ্যাঁ—'

ব্যোমকেশ তখন বলিল—'ও কথা থাক। আপনি ওদের ঘরের লোক, নাড়ীর খবর রাখেন, কে খুন করেছে আন্দাজ করতে পারেন না ?'

কেষ্টবাবু কিয়ৎকাল নতনেত্রে থাকিয়া চোখ তুলিলেন—'আপনাকে ধম্মকথা বলব, বাড়ির কেউ এ-কাজ করেনি।'

'কারুর ওপর আপনার সন্দেহ হয় না ?'

'সন্দেহ সকলের ওপরেই হয়, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। এ ওই ভাইপো ছুটোর কাজ। ভেবে দেখুন, বাড়ির লোকের অনাদিকে মেরে লাভ কি ? সকলেই ছিল অনাদির অন্নদাস। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, দু'দিন বাদে হাঁড়ি চড়বে না।'

'হাঁড়ি চড়বে না কেন ? নৃপেন মাইনের চাকর ছিল সে অন্যত্র চাকরি খুঁজে নেবে। আর প্রভাত ? তার তো দোকান রয়েছে।'

'দোকান থাকবে কি ? ভাইপো'রা মোকদ্দমা করে কেড়ে নেবে।'

'যদি কেড়েও নেয়, তবু ওদের অন্নাভাব হবে না। প্রভাত আর কিছু না পারুক, দপ্তরীর কাজ করে নিজের পেট চালাতে পারবে।'

'দপ্তরীর কাজ !' কেষ্টবাবু চকিতে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

'আপনি জানেন না? প্রভাত দপ্তরীর কাজ জানে, ছেলেবেলায় দপ্তরীর দোকানে কাজ শিখেছে।'

পুঁটিরাম চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। কেষ্টবাবু জলখাবারের রেকাবি তুলিয়া লইয়া আহারে মন দিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিল। একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'কি আশ্চর্য, আমি জানতাম না।'

ব্যোমকেশ বলিল—'না-জানা আর আশ্চর্য কি! দপ্তরীর কাজ এমন কিছু মহৎ কাজ নয় যে কেউ ঢাক পেটাবে।'

কেষ্টবাবু একবার ধূর্ত চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—'তা বটে।'

পানাহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল—'আজ সকালে আপনি বলেছিলেন, অনাদি হালদারের সব গুপ্ত কথা আপনি জানেন, ইচ্ছে করলে তাকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারেন—

কেষ্টবাবু ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'গুপ্ত কথা! না না, আমি অনাদির গুপ্ত কথা কোত্থেকে জানব? মদের মুখে কি বলেছিলাম তার কি কোনও মানে হয়? আচ্ছা, আজ চললাম, অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল—'শুনুন, কেষ্টবাবু'—তিনি দ্বারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—'গুপ্ত কথা না বলতে চান, না বলবেন, আমার বেশি আগ্রহ নেই। কিন্তু আজ রাত্তিরে এখানে খাওয়া-দাওয়া করতে তো দোষ নেই। ওখানে হয়তো আজ আপনার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে—'

কেষ্টবাবু সাগ্রহে দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিলেন—'খাওয়া-দাওয়া—!'

'হ্যাঁ। আপনার খাতিরে আজ না-হয় একটু তরল পদার্থের ব্যবস্থা করা যাবে।'

'সত্যি বলছেন। আপনারও তাহলে অভ্যেস আছে! মোদ্দা দিদিমণি না জানতে পারে, কেমন? হ্যাঁ হ্যাঁ। কটার সময় আসব বলুন।'

'সন্ধ্যের পরই আসবেন। আমাকে বোধ হয় একবার বেরুতে হবে। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যদি ফিরতে দেরি হয় চাকর আপনাকে বসাবে।'

'বেশ বেশ, আমি সন্ধ্যের পরই আসব।' দ্রংস্ট্রাবিকট হাস্য করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ আমার প্রতি চোখ নাচাইয়া বলিল—'সাদা চোখে কেষ্ট দাস কিছু বলবে না।—অজিত, তুমি শুঁড়ি বাড়ি যাও, একটি পাঁট বোতল কিনে নিয়ে এস। নাসিক হুইস্কি হলেই চলবে। এদিকে আমি পুঁটিরামকে তালিম দিয়ে রাখছি।'

দশ

পাঁচটার সময় দুইজনে বাহির হইলাম।

পুঁটিরামকে তালিম দেওয়া হইয়াছে। বসিবার ঘরে টেবিলের উপর বোতল কর্ক-স্ক্রু ও কাচের গেলাস রাখা হইয়াছে। বাহিরের দ্বারে কড়া নাড়িলে পুঁটিরাম আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিবে এবং ভেট্‌কি মাছের মত মুখ দেখিলে বলিবে—'আসুন বাবু, কর্তারা বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরবেন।' ভেট্‌কি মাছকে টেবিলের নিকট বসাইয়া পুঁটিরাম ডিম ভাজিয়া আনিয়া দিবে এবং নিজে গা-ঢাকা দিবে। তারপর—

ফুটপাতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথায় চলেছি আমরা?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল—"কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নেই। কেষ্ট দাস এসে বোতলটা সাবাড় করবে তারপর আমরা ফিরব।'

'তা বুঝেছি। কিন্তু ততক্ষণ করব কী?'

'ততক্ষণ চল গোলদীঘিতে বায়ু সেবন করা যাক।'

গোলদীঘিতে গিয়া পাক খাইতে লাগিলাম। বেশী কথাবার্তা হইল না; ব্যোমকেশ একবার বলিল—'কেষ্ট দাস গলিতে চাবি ফেলেনি।'

এক সময় চোখে পড়িল য়্যুনিভারসিটি ইন্‌স্টিট্যুটে অনেক লোক প্রবেশ করিতেছে, বোধহয় কোনও অনুষ্ঠান আছে। ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশকে বলিলাম—'চল না, দেখা যাক ওখানে কি হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল—'চল। সম্ভবত কোনও বিখ্যাত লোকের মৃত্যু উপলক্ষে উৎসব-সভা বসেছে।'

য়্যুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটে প্রবেশ করিতে গিয়া ইন্দুবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি সিনেমার লোক, তার উপর সঙ্গীতজ্ঞ; অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছেন। ব্যোমকেশের অনুমান মিথ্যা নয়, সিনেমার এক দিক্‌পালের মৃত্যুবাসরে তাঁহার সহধর্মীরা নৃত্য-গীত দ্বারা শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইন্দুবাবুর সহিত ব্যোমকেশের পরিচয় করাইয়া দিলাম। তিনি আমাদের লইয়া গিয়া সামনের দিকের একটা সারিতে বসাইয়া দিলেন, নিজেও পাশে বসিলেন।

মঞ্চের উপর কয়েকটা পর্দায়-দেখা মুখ চোখে পড়িল, অন্য মুখও আছে। সভাপতি একজন পলিতকেশ চিত্রাভিনেতা।

মঞ্চস্থ লোকগুলির মধ্যে একটি মেয়ের মুখ বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অপরিচিত মুখ; সুন্দর নয়, কিন্তু চিত্তাকর্ষক। তন্বী নয়, পূর্ণাঙ্গী রঙ ফর্সা বলা চলে, একরাশ চুল ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলিত হইয়া লুটাইতেছে। যাহাকে যৌন আবেদন বলা হয়, যুবতীর তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। একটি ষণ্ডা গোছের যুবক তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার কানে কানে কথা বলিতেছে।

যে গানটা চলিতেছিল তাহা শেষ হইল। সভাপতি একটি চিরকুট হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'এবার কুমারী শিউলী মজুমদার গাইবেন—কোথা যাও ফিরে চাও দূরের পথিক।'

যে যুবতীকে আমি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহারই নাম শিউলী মজুমদার। সে সংহত মন্থরপদে সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল, ষণ্ডা যুবক বাঁয়াতবলা লইয়া বসিল। গান আরম্ভ হইল।

গলাটি মিষ্ট, নিটোল, কুহক-কলিত। চোখ বুজিয়া শুনিতে

লাগিলাম। তারপর ব্যোমকেশের কনুইয়ের গুঁতা খাইয়া চমক ভাঙিল। ব্যোমকেশ কানে কানে বলিল—'ওহে, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখ।'

বাঁ দিকে সন্তর্পণে চক্ষু ফিরাইলাম। কয়েকখানা চেয়ার বাদে প্রথম সারিতে প্রভাত বসিয়া আছে। তন্ময় সমাহিত মুখের ভাব, একাগ্র দৃষ্টি গায়িকার উপর বিন্যস্ত। প্রভাত বোধহয় আমাদের দেখিতে পায় নাই, পাইলে এতটা একাগ্র হইতে পারিত না। ব্যোমকেশের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মুখে একটু বাঁকা হাসি লইয়া সে গান শুনিতেছে।

আমার মাথার মধ্যে দিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। শিউলী মজুমদার—যাহাকে প্রভাত বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এ কি সেই ?···

শিউলী মজুমদারের গান শেষ হইল। তারপর আরও কয়েকজন গাহিলেন। লক্ষ্য করিলাম, শিউলী মজুমদারের গান শেষ হইবার পর প্রভাত অলক্ষিতে উঠিয়া গেল।

সভা শেষ হইবার পূর্বে আমরাও উঠিলাম। ইন্দুবাবু আমাদের সঙ্গে দ্বার পর্যন্ত আসিলেন।

ব্যোমকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'ঐ শিউলী মজুমদার নামে মেয়েটি—খাসা গায়। ও কি সিনেমার মেয়ে ?'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'না, এখনও ঢোকে নি। তবে গদানন্দ যখন জুটেছে তখন আর দেরী নেই।'

'গদানন্দ ?'

'ওই যে তবলা বাজাচ্ছিল। লোকটা সিনেমার দালাল। ভদ্রঘরের মেয়েদের গান বাজনা শেখানো ওর পেশা, কিন্তু জুৎসই মেয়ে পেলে সিনেমায় টেনে নিয়ে যায়।'

'তাই নাকি ! ওর সত্যি নাম গদানন্দ ?'

'নাম জগদানন্দ। সিনেমায় সবাই গদানন্দ বলে। অনেক মেয়ের মাথা খেয়েছে।'

'শিউলীর বাপের নাম আপনি জানেন ?'

'নামটা যেন শুনেছিলাম—হ্যাঁ, দয়ালহরি মজুমদার। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে।'

*　　　*　　　*　　　*

বাসায় ফিরলাম সাতটার সময়।

দরজা ভেজানো ছিল, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কেষ্টবাবু তক্তাপোশের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছেন, ডান হাতের তর্জনীকে বন্দুকে পরিণত করিয়া ঘরের কোণে লক্ষ্য স্থির করিতেছেন। মদের বোতলটা শূন্য উদরে একপাশে পড়িয়া আছে। কেষ্টবাবু আমাদের প্রবেশ জানিতে পারিলেন না, ঘরের ঊর্ধ্ব কোণ তাগ করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন—'গুড়ুম—ফিস্।'

আওয়াজটা অবশ্য তিনি মুখেই উচ্চারণ করিলেন।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'কেষ্টবাবু, কি হচ্ছে ?'

কেষ্টবাবু বলিলেন—'চুপ্—পাখী উড়ে যাবে।—গুড়ুম ফিস্।'

ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—'ও—পাখী শিকার করছেন। তা ক'টা পাখী মারলেন ?'

কেষ্টবাবু বন্দুক নামাইয়া সহজভাবে বসিলেন—'তিনটে হর্তেল ঘুঘু মেরেছি।' তাঁহার শিথিল মুখমণ্ডলে একটু তৃপ্তির হাসি খেলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল—বেশ বেশ।—কিন্তু গুড়ুম্—ফিস্ কেন ? গুড়ুম্ না হয় বুঝলাম, ফিস্ কী ?'

কেষ্টবাবু বলিলেন—'ফিস্ বুঝলেন না? গুড়ুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ হল, আর ফিস্ করে পাখীর প্রাণ বেরিয়ে গেল।'

কেষ্টবাবু শয়ন করিলেন। দেখিলাম তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তাঁহাব ঘুম ভাঙাইলাম, তারপব আহাব শেষ করিয়া আবার তক্তাপোশে আসিয়া বসিলাম। কেষ্টবাবুর অবস্থা এখন অনেকটা ধাতস্ত, পক্ষী শিকারের আগ্রহ আর নাই।

কেষ্টবাবুকে সিগাবেট দিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—'কেষ্টবাবু, আপনাকে দেখে মনে হয় বয়স কালে আপনি ভা র জোয়ান ছিলেন।'

কেষ্টবাবু মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—'কী শরীর যে ছিল ব্যোমকেশবাবু, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ইয়া ছাতি, ইয়া হাতের গুলি; একটা আস্তপাঁঠা একলা খেয়ে ফেলতে পারতাম। লোকে ডাকত—ভীম-কেষ্ট।'

'নিশ্চয় খুব মাবামারি করতেন? অনেক সায়েব ঠেঙিয়েছেন?'

'সায়েব কি বলছেন, জাহাজী গোবা পর্যন্ত ঠেঙিয়েছি। ব্যাটারা মদ খাবার জন্যে জাহাজ থেকে নামত। গলিঘুজিতে ঘুরে বেড়াত। আমি ওৎ পেতে থাকতাম, কাউকে একলা পেলে দু'চার ঘা দিয়েই লম্বা। হ্যা হ্যা।'

'আপনি দেখছি আমার মনের মতন মানুষ।—আচ্ছা, কখনও মানুষ খুন কবেছেন?' ব্যোমকেশ অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার পাশে ঘেষিয়া বসিল।

'মানুষ খুন—!' কেষ্টবাবু ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে তাকাইলেন।

'আরে মশাই, ভয় কিসের? ইয়ার বন্ধুর কাছে বলতে দোষ কি? এই তো আমি তিনটে মানুষ খুন করেছি। অজিত জানে, ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

কেষ্টবাবু আশ্বস্ত হইলেন,—'ঠিক নিজের হাতে খুন করিনি, তবে দলে ছিলাম। ওই অনাদিটা—'

'অনাদি হালদারের সঙ্গে বুঝি আপনার অনেক দিনের পরিচয় ?'

'ইস্কুল থেকে। অনাদিটা ছিল পগেয়া শয়তান। কিন্তু গায়ে জোর ছিল না, তাই আমাকে দলে টানত। আমি ইস্কুলে ভাল ছেলে ছিলাম মশাই, ওই অনাদির পাল্লায় পড়ে বিগড়ে গেলাম।'

'তারপর ?'

'একটা ডেপুটির ছেলে সাইকেল চড়ে ইস্কুলে আসত। একদিন আমি আর অনাদি সাইকেল নিয়ে সট্‌কান্ দিলাম, চোরাবাজারে দিলাম বেচে। কিন্তু ডেপুটির ছেলের সাইকেল, পুলিস লাগল। ধরা পড়ে গেলাম। হেড্‌মাস্টার দু'জনকে রাষ্টিকেট করে দিলে।'

'ঐ তো। হেডমাস্টারগুলো বড় পাজি হয়।—তারপর কি হল ?'

'তারপর আর কি! নাম কাটা সেপাই! বছর দুই পরে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। আর আমাদের পায় কে ? একেবারে মেসোপোটেমিয়া। বাসরা……কুট্-এল্-আমারা—ভারি ফূর্তিতে কেটেছিল ক'টা বছর!'

'সেই সময় বুঝি রাইফেল চালাতে শিখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। অব্যর্থ টিপ্ ছিল। কুট-এল্-আমারায় যখন আট্‌কা পড়েছিলাম তখন আমাদের রসদে টান পড়েছিল, ঘোড়ার মাংস খেতে হয়েছিল। তখন আমি রাইফেল দিয়ে উড়ন্ত পাখী শিকার করতাম। ক্যাপ্টেন আমার নাম দিয়েছিল—উইলিয়াম টেল্! সে এক দিন ছিল।' নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এলাম। আবার পুনর্মূষিক…তার কিছুদিন পরে অনাদি এক কাণ্ড করে বসল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাপকে ঠেঙিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল। এমন ঠেঙিয়েছিল যে বাপটা পরের দিনই টেঁসে গেল। বাড়ির লোকেরা

অবশ্য ব্যাপারটা চাপাচুপি দিয়ে দিল, কিন্তু অনাদি সেই যে পালাল, পাঁচ বছর আর তার দেখা নেই।

'পাঁচ বছর পরে একদিন গভীর রাত্রে অনাদি চুপিচুপি আমার কাছে এসে হাজির। বললে—ব্যবসা করবি তো চল আমার সঙ্গে, খুব লাভের ব্যবসা। আমি জিগ্যেস করলাম—কিসের ব্যবসা? কোথায় যেতে হবে? সে বললে—বেহারের একটা ছোট্ট শহরে। মাড়োয়ারীর সঙ্গে ব্যবসা। একলা সে ব্যবসা হয় না তাই তোকে নিতে এসেছি। রাতারাতি ববাত ফিরে যাবে। যাবি তো চল্।— আমাব তখন সময়টা খারাপ যাচ্ছে, রাজি হয়ে গেলাম।

'বেহারের নগণ্য একটা জায়গা, নাম লালনিয়া। সামনে দিয়ে রেলের লাইন গেছে। পিছনদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। আমরা ইস্টিশানে নেমে শহরে গেলাম না, দিনের বেলায় জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। সেখানে অনাদি আসল কথা খুলে বলল—শহরের একটেরে জঙ্গলের গা ঘেঁসে এক মাড়োয়ারীর গদি আছে, বুড়ো মাড়োয়ারীটা রাত্তিরে একলা থাকে। বুড়োর অনেক টাকা গদিতে ডাকাতি করতে হবে।

'দুপুর রাত্রে মাড়োয়ারীর গদিতে গেলাম। আমার হাতে লোহাব ডাণ্ডা; অনাদির হাতে ইলেক্‌ট্রিক টর্চ, কোমরে ভোজালি। মাড়োয়ারীটা চোরাই মালের কারবার করত, রাত্রে চোরেরা তাব কাছে আসত। অনাদি দরজায় টোকা দিতেই সে দরজা খুলে দিলে, আমি লাগালাম তার মাথায় এক ডাণ্ডা। বুড়োটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

'গদি লুঠ করলাম। বেশী কিছু পাওয়া গেল না, হাজার তিনেক নগদ আর কিছু সোনার গয়না। তাই নিয়ে বেরুচ্ছি, মাড়োয়ারীটা দোরগোড়ায় পড়ে ছিল, হঠাৎ অনাদির ঠ্যাং জড়িয়ে ধরল। অনেক ধস্তাধস্তি করেও অনাদি ঠ্যাং ছাড়াতে পারল না, মাড়োয়ারী মরণ-

কামড় কম্‌ড়ে ধরেছে। তখন সে কোমর থেকে ভোজালি বার করে মারল বুড়োর ঘাড়ে এক কোপ। বুড়োটা ক্যাঁক্‌ করে মরে গেল।

'রক্তমাখা ভোজালি সেইখানে ফেলে আমরা পালালাম। শেষরাত্রে ই স্টিশানে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। লুঠের মাল অনাদির কাছে ছিল ; সে বলল—তুই এক গাড়িতে ওঠ্‌ আমি অন্য গাড়িতে উঠি। দু'জনে এক কামরায় উঠলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। উঠে পড়্‌, উঠে পড়্‌, পরের স্টেশনে আবার দেখা হবে। আমি একটা কামরায় উঠে পড়লাম, অনাদি পাশের কামরায় উঠল।

'ব্যস্‌, সেই যে অনাদি লোপাট হ'ল, বিশ বছরের মধ্যে আর তার টিকি দেখতে পেলাম না—বেইমান! বিশ্বাসঘাতক!'

পুরাতন টাকার শোকে কেষ্টবাবু ফুঁসিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে আর একটি সিগারেট দিয়া বলিল—'অনাদি হালদার বেইমান ছিল তাই তো তার আজ এই দুরবস্থা। কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন ইচ্ছে করলে অনাদিকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারেন তার মানে কি? তাকে ফাঁসাতে গেলে আপনি নিজেও যে ফেঁসে যেতেন।'

কেষ্টবাবু বলিলেন—'মাড়োয়ারী-খুনের ব্যাপারে খুব হৈ চৈ হয়েছিল, কাগজে লেখালেখি হয়েছিল। পুলিস ভোজালির গায়ে অনাদির আঙুলের ছাপ পেয়েছিল। কিন্তু অনাদিকে তো তারা চেনে না, তাকে ধরবে কি করে? একমাত্র আমি জানতাম। আমি যদি পুলিসকে একটি বেনামী চিঠি ঝাড়তাম—লালনিয়ার খুনীর নাম অনাদি হালদার, সে অমুক ঠিকানায় থাকে, আঙুলের ছাপ মিলিয়ে নাও—তাহলে কী হত?'

ব্যোমকেশ বলিল—'বুঝেছি। তারপর আবার কবে অনাদি হালদারকে পেলেন?'

কেষ্টবাবু দন্তপংক্তি কোষমুক্ত করিলেন—'বছর দুই আগে, এই কলকাতা শহরে। ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি অনাদি বৌ-বাজারের বাসায় ঢুকছে। আর যাবে কোথায়! খোঁজখবর নিয়ে জানলাম অনাদি পয়সা করেছে, দুধেভাতে আছে। একবার ভাবলাম দিই পুলিসকে বেনামী চিঠি। কিন্তু আমার সময়টা তখন খারাপ যাচ্ছে—একদিন গিয়ে দেখা করলাম। অনাদি ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল। আমি বললাম—আজ থেকে আমাকেও দুধে-ভাতে রাখতে হবে, নইলে লালনিয়ার মাড়োয়ারীকে কে খুন করেছে পুলিস জানতে পারবে। খুনের মামলা তামাদি হয় না।'···

রাত হইয়া গিয়াছিল, কেষ্টবাবু আমাদের তক্তাপোশেই রাত্রি কাটাইলেন।

এগার

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতে দেরী হইল। তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে গিয়া দেখি, ব্যোমকেশ বসিয়া চিঠি লিখিতেছে, কেষ্টবাবু নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—'শিকারী কোথায় ?'

ব্যোমকেশ সহাস্য চোখ তুলিয়া বলিল—'রাত না পোয়াতে কখন উঠে পালিয়েছে।'

কাল রাত্রে মদের মুখে যে-সব কথা প্রকাশ পাইয়াছে আজ সকালে তাহা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় কেষ্টদাস সরিয়াছে।

তক্তাপোশে বসিলাম—'সাত সকালে কা'কে চিঠি লিখতে বসলে ?'

ব্যোমকেশ চিঠিখানা আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া আর একখানা চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। চিঠি পড়িয়া দেখিলাম—

ভাই রমেশ, এতদিন পরে আমাকে কি তোমার মনে আছে। এক সঙ্গে বহরমপুরে পড়েছি। প্রফেসারেরা আমাকে bomb-case বলে ডাকতেন। মনে পড়ছে ?

নৃপেন দত্ত নামে একজনের মুখে খবর পেলাম, তুমি তোমার গ্রামেই আছ। নৃপেনকে তুমি চেনো, তোমার পাড়ার ছেলে। তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

কলকাতায় তোমার আসা যাওয়া নিশ্চয় আছে। একবার এসো না আমার বাসায়। ঠিকানা দিলাম।

কবে আসছ ? ভালবাসা নিও।

ইতি

তোমার পুরোনো বন্ধু

ব্যোমকেশ বক্সী

দ্বিতীয় পত্রখানি নিমাই নিতাইকে লেখা—

নিমাইবাবু, নিতাইবাবু,

শ্রীকান্ত পান্থনিবাসের তেতালার ঘরের কথা জানিতে পারিয়াছি। আমার সঙ্গে অবিলম্বে আসিয়া দেখা করুন, নচেৎ খবরটি পুলিস জানিতে পারিবে।

ব্যোমকেশ বক্সী

চিঠি দুখানি খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিল। পুঁটিরাম বাজারে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল, তাহার হাতে চিঠি দু'খানি ডাকে দিবার জন্য দিয়া ব্যোমকেশ আমাকে বলিল—'চল, আজ সকালেই বেরুতে হবে।'

'কোথায়?'

'দয়ালহরি মজুমদারের বাসার ঠিকানা মনে আছে তো?'

'১৩।৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার।'

আধ ঘণ্টা পরে আমরা বাহির হইলাম। শ্যামবাজারে গিয়া রামতনু লেন খুজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিল। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে গলিটি ক্ষুদ্র, দুই ধারের দুইটি বড় রাস্তার মধ্যে যোগসাধন করিয়াছে। আমরা একদিক হইতে নম্বর দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম।

গলির প্রায় মাঝামাঝি পৌছিয়াছি হঠাৎ ও-প্রান্তের একটা বাড়ি হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিল, ঝড়ের মত আমাদের দিকে অগ্রসর হইল। চিনিলাম—প্রভাত। সে আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, আমাদের দেখিতে পাইল না। উস্কখুস্ক চুল, আরক্ত মুখ-চোখ; আগুনের হল্কার মত সে আমাদের পাশ দিয়া বহিয়া গেল।

আমরা ভ্রূ তুলিয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম, তারপর যে দ্বার দিয়া প্রভাত বাহির হইয়াছিল সেই দিকে চলিলাম। নম্বর খুঁজিবার আর প্রয়োজন নাই। ব্যোমকেশ মৃদুগুঞ্জনে বলিল— 'অনাদি হালদার সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিল…এখন সে নেই, তাই প্রভাত আবার এসেছিল…কিন্তু সুবিধে হল না…'

১৩।৫ নম্বর বাড়ির দরজা বন্ধ। আমরা ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছি, বাড়ির ভিতর হইতে মেয়েলি গলার গান আরম্ভ হইল। মিষ্ট নিটোল কুহক-কলিত কণ্ঠস্বর, সঙ্গে তবলার সঙ্গত।

ব্যোমকেশ দ্বারে ধাক্কা দিল। ভিতরে গান বন্ধ হইল। একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি দ্বার খুলিলেন। এক জোড়া কঠিন চক্ষু আমাদের আপাদমস্তক পরিদর্শন করিল।

'কি চাই?' লোকটির আকৃতি যেমন বেউড় বাঁশের মত পাকানো, কণ্ঠস্বরও তেমনি শুষ্ক রুক্ষ। একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে।

ব্যোমকেশ বলিল—'আপনার নাম কি দয়ালহরি মজুমদার?'

'হাঁ। কি দরকার?' ভিতরে প্রবেশ করিবার আহ্বান আসিল না, বরং গৃহস্বামী দুই কবাট ধরিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল—'অনাদি হালদার মারা গেছে, শুনেছেন বোধ হয়। তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই—'

'কে অনাদি হালদার! আমি জানি না।' দয়ালহরিবাবুর শুষ্ক স্বর উগ্র হইয়া উঠিল।

'জানেন না? তার আলমারীতে আপনার হ্যাণ্ড্‌নোট পাওয়া গেছে। আপনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন।'

'কে বলে আমি ধার নিছি! মিথ্যা কথা। কারুর এক পয়সা আমি ধারি না।'

'হ্যাণ্ডনোটে আপনার দস্তখৎ আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'জাল দস্তখৎ।' দড়াম্ শব্দে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

আমরা কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর ফিরিয়া চলিলাম। পিছনে গান ও সঙ্গত আবার আরম্ভ হইল। ভৈরবী একতালা।

ট্রামরাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল—'দয়ালহরি মজুমদার লোকটি সামান্য লোক নয়। অনাদি হালদার মরেছে শুনে ভাবছে পাঁচ হাজার টাকা হজম করবে। হ্যাণ্ডনোটে যে দস্তখৎ করেছে সেটা হয়তো ওর আসল দস্তখৎ নয়, বেঁকিয়ে চুরিয়ে দস্তখৎ করেছে; মামলা যদি আদালতে যায় তখন অস্বীকার করবে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়; প্রশ্ন হচ্ছে, অনাদি হালদার ওকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিলে কেন?'

বলিলাম—'অনাদি হালদারের তেজারতির ব্যবসা ছিল হয়তো।'

'তাই বলে বিনা জামিনে শুধু হাতে পাঁচ হাজার টাকা ধার দেবে! অনাদি হালদার কি এতই কাঁচা ছেলে ছিল? বানরে সঙ্গীত গায় শিলা জলে ভেসে যায় দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

'তবে কি হতে পারে?'

'জানি না। কিন্তু জানতে হবে।—আমার কি সন্দেহ হয় জানো?'

'কী?'

বলিবার জন্য মুখ খুলিয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল। তারপর আকাশের পানে চোখ তুলিয়া বলিল—'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্!'

অতঃপর আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

সেদিন বৈকালে আবার আমরা বাহির হইলাম। এবার গন্তব্য-স্থান প্রভাতের দোকান।

দোকানের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি, দেখি আর পাঁচজন লোকের মধ্যে বাঁটুল সর্দার আমাদের আগে আগে চলিয়াছে। প্রভাতের

দোকানের সামনে আসিয়া বাঁটুলের গতি হ্রাস হইল, মনে হইল সে দোকানে প্রবেশ করিবে। কিন্তু প্রবেশ করিবার পূর্বে সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। অমনি বাঁটুল আবার সিধা পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকাইলাম। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত, চোয়ালের হাড় শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি মৃদুস্বরে বলিলাম —'বাঁটুল কি এবার প্রভাতকে খদ্দের পাক্‌ড়াতে চায় নাকি?'

ব্যোমকেশ গলার মধ্যে শুধু আওয়াজ করিল।

দোকানে প্রবেশ করিলাম।

খরিদ্দার নাই কেবল প্রভাত কাউন্টারে কনুই রাখিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না। আমাদের পদশব্দে সে চোখ তুলিল। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। ক্ষণকাল অচেনা চোখে চাহিয়া থাকিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'আসুন।'

আমরা কাউন্টারের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুস্তকালয়ের রাশি রাশি বই আমার মনে মোহ বিস্তার করে, আমি চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশের ওসব বালাই নাই। সে বলিল—'সামান্য একটা কাজে এসেছিলাম। দেখুন তো, এই চাবিটা চিনতে পারেন?'

প্রভাত ব্যোমকেশের হাত হইতে চাবি লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। বলিল—'না। কোথাকার চাবি?'

ব্যোমকেশ বলিল—'তা আমি জানি না। আপনাদের বাসার পাশে গলিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

'কি জানি, আমি কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। নতুন চাবি দেখছি। হয়তো রাস্তার কোনও লোকের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

প্রভাত চাবি ফেরত দিল। ব্যোমকেশ তাহা পকেটে রাখিয়া বলিল—'কেষ্টবাবুর খবর কি? তিনি আজ সকালবেলা আপনার বাসায় ফিরে গিয়েছিলেন?'

প্রভাত ক্ষীণ হাসিল,—'হ্যাঁ। কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন।'

কোথায় গিয়েছিলেন ব্যোমকেশ তাহা বলিল না, জিজ্ঞাসা করিল—'কেষ্টবাবু তাহলে আপনার স্কন্ধেই রইলেন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কি করা যায়? গলাধাক্কা তো দেয়া যায় না।'

'তা বটে। নৃপেনবাবু কোথায়? চলে গেছেন?'

'না, এখনও যায়নি। তার দু'মাসের মাইনে বাকি···গরীব মানুষ···ভাবছি তাকে রেখে নেব। দোকানে একজন লোক রাখলে ভাল হয়, ওকেই রেখে নেব ভাবছি।'

ব্যোমকেশ বলিল—'মন্দ কি। আচ্ছা, নিমাই নিতাই বোধ হয় আর আসেনি? আলমারি কি পুলিসের পক্ষ থেকে শিল করে দিয়ে গেছে?'

'না, পুলিস আর আসেনি। তবে অনাদিবাবুর কোমরে যে চাবি ছিল সেটা তারা নিয়ে গেছে। আলমারির বোধ হয় ঐ একটাই চাবি ছিল।'

'তা হবে। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দয়ালহরি মজুমদার নামে একজনকে অনাদি হালদার পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল আপনি জানেন?'

প্রভাত কিছুক্ষণ অবিশ্বাস-ভরা বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া রহিল—'পাঁচ হাজার টাকা! আপনি ঠিক জানেন?'

'অনাদি হালদারের আলমারিতে আমি হ্যাণ্ডনোট দেখেছি। তাতে দয়ালহরি মজুমদারের সই আছে।'

প্রভাতের শীর্ণ মুখ যেন আরও শুষ্ক ক্লান্ত হইয়া উঠিল, সে অর্ধস্ফুট

স্বরে বলিল—'আমি জানতাম না। কখনও শুনিনি।' সে টুলের উপর বসিতে গিয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া খপ্‌ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

'প্রভাতবাবু! আপনার জ্বর হয়েছে—গা গরম।'

'জ্বর! না—ও কিছু নয়। ঠাণ্ডা লেগেছে—'

'হয়তো বুকে ঠাণ্ডা বসেছে। আপনি দোকানে এলেন কেন? যান, বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকুন। ডাক্তার ডাকান—।'

'ডাক্তার!' প্রভাত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—'না না, ওসব হাঙ্গামায় দরকার নেই। আপনিই সেরে যাবে।'

'আমার কথা শুনুন, কাছেই আমার চেনা একজন ডাক্তার আছেন, তাঁর কাছে চলুন। রোগকে অবহেলা করা ভাল নয়। আসুন।'

প্রভাত আরও কয়েকবার আপত্তি করিয়া শেষে রাজি হইল। দোকানে তালা লাগাইয়া বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার গুর্খা দারোয়ানটিকে দেখছি না। তাকে কি ছাড়িয়ে দিয়েছেন?'

প্রভাত বলিল—'হ্যাঁ। অনেকদিন দেশে যায়নি, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমারও আর পাহারাওলার দরকার নেই—বলিয়া ফিকা হাসিল।

দুই তিন মিনিটে ডাক্তার তালুকদারের ডাক্তারখানায় পৌঁছিলাম। তিনি ডাক্তারখানায় উপস্থিত ছিলেন; ব্যোমকেশ তাঁহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কথাবার্তা বলিল। তারপর তিনি প্রভাতকে ঘরে লইয়া গিয়া টেবিলের উপর শোয়াইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আমরা সরিয়া আসিলাম।

পরীক্ষার শেষে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—'বুকে পিঠে কিছু পেলাম না। তবে স্নায়ুতে গুরুতর শক্ লেগেছে। একটা ওষুধ দিচ্ছি, এক শিশি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখিতে গেলেন, ব্যোমকেশও তাঁহার সঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঔষধের শিশি হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'চলুন। ডাক্তারের প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়েছি।'

প্রভাত বিব্রত হইয়া বলিল—'সে কি, আপনি কেন দিলেন? আমার কাছে টাকা রয়েছে—'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন চলুন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

প্রভাতের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল—'আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করছেন—'

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল—'সংসারে থাকতে গেলে পরস্পরের জন্যে একটু কষ্ট করতে হয়। আসুন।'

ভাড়াটে গাড়িতে প্রভাতকে লইয়া আমরা তাহার বাসার উদ্দেশ্যে চলিলাম। ব্যোমকেশের এই পরহিতব্রতের অন্তরালে কোনও অভিসন্ধি আছে কিনা, এই প্রশ্নটা বার বার মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল।

বাসায় পৌঁছিলে ননীবালা দেবী প্রভাতের জ্বরের সংবাদ শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। তিনি অভিজ্ঞ ধাত্রী। ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলিতে হইল না। আমরা বিদায় লইলাম।

বাহিরের ঘরে আসিয়া ব্যোমকেশ দাঁড়াইয়া পড়িল। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, তাহার যাইবার ইচ্ছা নাই। আমি ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, উত্তরে সে বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। নৃপেন প্রবেশ করিল; আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—'আপনারা?'

ব্যোমকেশ বলিল—'প্রভাতবাবুর শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।'

'প্রভাতবাবুর শরীর খারাপ!' নৃপেন ভিতর দিকে পা বাড়াইল।

'একটা কথা—' ব্যোমকেশ চাবি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল—'এ চাবিটা চিনতে পারেন?'

নৃপেনের চোখের চাহনি এতক্ষণ সহজ ও সিধা ছিল, মুহূর্তে তাহা চোরা চাহনিতে পরিণত হইল। একবার ঢোঁক গিলিয়া সে স্বরযন্ত্র সংযত করিয়া লইল, তারপর বলিল—'চাবি? কার চাবি আমি কি করে চিনব? মাফ করবেন, প্রভাতবাবুর জ্বর—' কথা শেষ না করিয়াই সে প্রভাতের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ আমার কানে কানে বলিল—'অজিত তুমি দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি।' সে লঘুপদে অনাদি হালদারের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

একলা দাঁড়াইয়া আছি; ভাবিতেছি, কেহ যদি আসিয়া পড়ে এবং ব্যোমকেশ সম্বন্ধে সওয়াল আরম্ভ করে, তখন কি বলিব! কিন্তু মিনিটখানেক পরে ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিল, বলিল,—'চল এবার যাওয়া যাক।'

নীচে দাওয়ায় বসিয়া ষষ্ঠীবাবু হুঁকা চুষিতেছিলেন, আমাদের পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইলেন। রাস্তায় আলো জ্বলিয়াছে। আমরা দ্রুত বাসার দিকে পা চালাইলাম। চলিতে চলিতে ব্যোম-কেশ বলিল—'অনাদি হালদারের আলমারির চাবিই বটে এবং কে গলিতে ফেলেছিল, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই।'

বার

হপ্তাখানেক কাটিয়া গেল। কোনও দিক হইতে আর কোনও সাড়া শব্দ নাই। নিতাই-নিমাইকে ব্যোমকেশ অবিলম্বে আসিয়া দেখা করিতে বলিয়া ছিল, তাহারাও নিশ্চুপ। আবার যেন সব ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। ইস্টিশন হইতে ট্রেন ছাড়িয়া গেলে যেমন হয়, এ যেন অনেকটা সেইরকম অবস্থা।

তারপর ট্রেন আসিল। একটার পর একটা ট্রেন আসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত এত ট্রেন আসিল যে নিশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না।

সকালবেলা ডাকে দুটি চিঠি আসিল। একটি চিঠি সত্যবতীর। সে দীর্ঘকাল আমাদের না দেখিয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে দর্শন চায়। দ্বিতীয় চিঠিখানি খেজুরহাটের রমেশ মল্লিকের। তিনি লিখিয়াছেন—

ভাই ব্যোমকেশ, তুমি তাহলে আমাকে ভোলনি? তোমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দ যে হ'ল বলতে পারি না। সেই পুরোনো ভুলে-যাওয়া কলেজ-জীবনের কথা আবার মনে পড়ে যাচ্ছে!

ভাই, আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যেতাম, কিন্তু কিছুদিন থেকে বাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছি, নড়বার ক্ষমতা নেই। তোমার কীর্তিকলাপ বইয়ে পড়েছি, তুমি কলকাতায় থাকো তাও জানি। কিন্তু ঠিকানা জানা ছিল না ব'লে এতদিন যেতে পারিনি। এবার সেরে উঠেই যাব।

তুমি যার কথা জানতে চেয়েছ তার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানি, দেখা হ'লে সব বলব। ভারি গুণী লোক। একবার জেল খেটেছে।

ওর প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে, যে-কোনও তালার চাবি একবার দেখলে অবিকল নকল চাবি তৈরী করতে পারে। গুণধর ছেলে, খুড়ো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। খুড়োর সিন্দুকের চাবি তৈরি করেছিল, মাঝে মাঝে পাঁচ দশ টাকা সরাতো। খুড়ো তাড়িয়ে দেবার পর কলকাতায় গিয়ে চাকরি করত, সেখানেও ক্যাশ্-বাক্সর চাবি তৈরি করেছিল। ধরা পড়ে জেলে গেল। সে আজ চার পাঁচ বছরের কথা। তুমি কোন্ সূত্রে তার সম্পর্কে এসেছ জানি না, কিন্তু সাবধানে থেকো।

তোমাকে দেখবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করছে। আজ এই পর্যন্ত। ভালবাসা নিও। ইতি—তোমার রমেশ।

ব্যোমকেশ বলিল—'গুণী লোক তাতে সন্দেহ কি। এমন গুণী লোক পৃথিবীতে অল্পই আছে। যা হোক, ন্যাপার কার্য-পদ্ধতি এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনাদি হালদার আলমারির চাবি কোমরে রাখত, দেখার সুবিধে ছিল না। কোনও সময় ন্যাপা একবার চাবিটা দেখে ফেলেছিল, সে চাবি তৈরি করল। আলমারিতে মাল আছে সে জানত, সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কালীপুজোর রাত্রে—'বলিয়া ব্যোমকেশ থামিল।

'কালীপুজোর রাত্রে কী?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখি—অপূর্ব দৃশ্য। উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী দুই পাশে দুই মক্কেল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কামিনীকান্তর মুখে সুধা-বিগলিত হাসি। নিমাই ও নিতাইকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া চেনা যায় না, সত্য সত্যই দুটি ভিজা বিড়াল। খালি পা, গায়ে গরদের দোছোট, মুখে অক্ষৌরিত দাড়ি, অশৌচের বেশ।

তিনজনে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ আরাম কেদারা হইতে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাহার মুখের তাচ্ছিল্য-ভাব

ক্রমে ব্যঙ্গহাস্যে পরিণত হইল। সে বলিল—'আপনারা শেষ পর্যন্ত এলেন তাহলে ?—বসুন।'

তিনজনে তক্তাপোশের কিনারায় বসিলেন। কামিনীকান্ত বলিলেন—'একটু দেরি হয়ে গেল। আপনি চিঠিতে যে-রকম ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা একলা আসতে সাহস করেনি, আমার কাছে ছুটে গিয়েছিল। তা আমি হলাম গিয়ে উকিল, একটু খোঁজ খবর না নিয়ে তো আসতে পারি না। তাই—'

'কোথায় খোঁজ-খবর নিলেন? শ্রীকান্ত পান্থনিবাসে? সেখানে বুঝি সুবিধে হল না? সাক্ষী ভাঙাতে পারলেন না? শ্রীকান্তবাবু সত্যের অপলাপ করতে রাজি হলেন না?'

কামিনীকান্ত আহত স্বরে বলিলেন—'ছি ছি, এ আপনি কি কি বলছেন ব্যোমকেশবাবু! সাক্ষী ভাঙানো আমার পেশা নয়, মক্কেলের পক্ষ থেকে সত্য আবিষ্কার করাই আমার কাজ।'

'সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে শ্রীকান্ত হোটেলে যাবার দরকার ছিল না, মক্কেল দুটিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন।'

'ওরা ছেলেমানুষ, তার ওপর অশৌচ চলছে। যাহোক, আপনি কি জানতে চান বলুন, কোনও কথাই ওরা আপনার কাছে লুকোবে না। ওদের বয়ান শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, ওরা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ব্যোমকেশ নিতাই ও নিমাইকে পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এঁদের মধ্যে শ্রীকান্ত হোটেলে যাতায়াত করতেন কে?'

কামিনীকান্ত বলিলেন—'ওরা দু'জনেই যেত। তবে ওদের চেহারা অনেকটা একরকম, তাই বোধ হয় হোটেলের লোকেরা বুঝতে পারেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল—'হুঁ। শ্রীকান্ত হোটেলের তেতলায় ঘর ভাড়া নেবার উদ্দেশ্য কি?'

কামিনীকান্ত বলিলেন—'তাহলে গোড়া থেকেই সব খুলে বলি—'

ব্যোমকেশ বলিল—'ওঁদের কথা ওঁরা নিজের মুখে বললেই ভাল হত না ?'

'হেঁ হেঁ, সে তো ঠিক কথা। তবে কি জানেন, ওরা ছেলেমানুষ, তার ওপর ব্যাপারস্যাপার দেখে খুবই নার্ভাস্ হয়ে পড়েছে। হয়তো বলতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবে—আপনি সন্দেহ করবেন ওরা মিছে কথা বলছে—'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ আপনিই বলুন তাহলে। বুঝতে পারছি আপনার বলা আর ওদের বলায় কোনও তফাৎ হবে না। মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কি ?'

ছেলেমানুষ দুটি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, কামিনীকান্ত তাদের জবানীতে কাহিনী বিবৃত করিলেন। মোটামুটি কাহিনীটি এই—

বছর দুই আগে অনাদি হালদার মহাশয় যখন কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন তখন নিমাই নিতাই খবর পাইয়া কাকার কাছে ছুটিয়া আসে। তাহারা পিতৃহীন, কাকাই তাদের একমাত্র অভিভাবক ; কাকাকে তাহারা সাবেক বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য নির্বন্ধ করে।

অনাদি হালদার অতিশয় সজ্জন এবং ভাল মানুষ ছিলেন, ভাইপো'দের প্রতি তাঁহার স্নেহেরও সীমা ছিল না। কিন্তু একদল দুষ্ট লোক তাঁহার ভালমানুষীর সুযোগ লইয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার কানে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল, ভাইপো'দের উপর তাঁহার মন বিরূপ করিয়া তুলিল। তিনি নিতাই নিমাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

নিমাই নিতাই ন্যায়ত ধর্মত অনাদি বাবুর উত্তরাধিকারী। তাহাদের ভয় হইল, এই দুষ্ট লোকগুলো কাকাকে ঠকাইয়া সমস্ত

সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে, হয়তো তাঁহাকে খুন করিতেও পারে। নিমাই নিতাই তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া শ্রীকান্ত হোটেলে ঘর ভাড়া করিল এবং জানালা দিয়া অনাদিবাবুর বাসার উপর নজর রাখিতে লাগিল। তাহাদের বাড়িতে একটা পুরোনো আমলের দূরবীণ আছে, সেই দূরবীণ চোখে লাগাইয়া অনাদিবাবুর বাসার ভিতরকার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিত। এই দেখুন সেই দূববীণ।

—নিমাই-নিতাইয়ের একজন চাদরেব ভিতর হইতে দূরবীণ বাহির করিয়া দেখাইল। চামড়ার খাপেব মধ্যে চোঙের মত দূরবীণ, টানিলে লম্বা হয়; ব্যোমকেশ নাড়িয়া চাড়িয়া ফেরৎ দিল। কামিনীকান্ত আবার আরম্ভ করিলেন।—

নিমাই নিতাই পালা করিয়া হোটেলে যাইত এবং চোখে দূববীণ লাগাইয়া জানালার কাছে বসিয়া থাকিত। অবশ্য ইহা নিতান্তই ছেলেমানুষী কাণ্ড। কামিনীকান্ত কিছু জানিতেন না, জানিলে এমন হাস্যকর ব্যাপার ঘটিতে দিতেন না। যাহোক, এইভাবে কয়েক মাস কাটিবাব পব কালীপূজোর রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি দশটা আন্দাজ নিমাই হোটেলে গিয়া দূরবীণ লাগাইয়া বসিল। অনাদিবাবু ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া বাজি পোড়ানো দেখিতেছিলেন। এগারোটার সময় এক ব্যাপার ঘটিল। অনাদিবাবু হঠাৎ পিছনের দরজার দিকে ফিরিলেন, যেন পিছনে কাহারও সাড়া পাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং বন্দুকের গুলি নিমাইয়ের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। ওদিকে ব্যাল্‌কনিতে অনাদিবাবু ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু ঘরের অন্ধকার হইতে কে গুলী চালাইয়াছে নিমাই তাহা দেখিতে পাইল না।

নিমাই ব্যাপার বুঝিতে পারিল। বন্দুকের গুলী অনাদিবাবুর

শরীর ভেদ করিয়া আর একটু হইলে নিমাইকেও বধ করিত ; ভাগ্যক্রমে গুলিটা তাহার রগ ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরিয়া গেল এবং দুই ভাইয়ে পরামর্শ করিয়া সেই রাত্রেই কামিনীকান্তর কাছে উপস্থিত হইল। তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে ব্যোমকেশবাবু তাহা ভালভাবেই জানেন।

ইহাই সত্য পরিস্থিতি, ইহাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নাই। ব্যোম-কেশবাবু বিবেচক ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে, পূজ্যপাদ খুল্লতাতকে বধ করা কোনও ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তিনি যেন পুলিসে খবর না দেন। পুলিস—বিশেষত বর্তমান-কালের পুলিস—যদি এমন একটা ছুতা পায় তাহা হইলে নিতাই-নিমাইকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িবে, নিরপরাধের প্রতি জুলুম করিবে। ইহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নয়। একেই তো অবিচার অত্যাচারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে।

কামিনীকান্ত শেষ করিলে ব্যোমকেশ আড়ামোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল, অলসকণ্ঠে বলিল—'এঁরা succession certificate-এর জন্যে দরখাস্ত করেছেন নিশ্চয়? তার কি হল ?'

কামিনীকান্ত বলিলেন—'দরখাস্ত করা হয়েছে। তবে আদালতের ব্যাপার, সময় লাগবে।'

ব্যোমকেশ বলিল– 'আমার বিশ্বাস প্রভাত কোনও আপত্তি তুলবে না। তবে বইয়ের দোকানটা তার নিজের নামে ; আপনারা যদি সেদিকে হাত বাড়ান্ তাহলে সে লড়্বে।'

'না না, অনাদিবাবু যা দান করে গেছেন তার ওপর ওদের লোভ নেই।—তাহলে ব্যোমকেশবাবু, আপনি শ্রীকান্ত হোটেলের কথাটা প্রকাশ করবেন না আশা করতে পারি কি ?'

'এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করে দেখব। নিমাইবাবু নিতাইবাবু

যদি নির্দোষ হন তাহলে নির্ভয়ে থাকতে পারেন। আচ্ছা, আজ আসুন তাহলে।'

তিনজনে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন, চোখে চোখে কথা হইল। তারপর কামিনীকান্ত একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—'আজ আমরা আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ক্ষতিপূরণস্বরূপ সামান্য কিছু—' বলিয়া পকেট হইতে পাঁচটি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

ব্যোমকেশের অধর ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হইয়া উঠিল—'আমার সময়ের দাম অত বেশী নয়। তাছাড়া, আমি ঘুষ নিই না।'

কামিনীকান্ত তাড়াতাড়ি বলিলেন—'না না, সে কি কথা। আপনি অনাদিবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করেছেন, তার তো একটা খরচ আছে। সে খরচ এদেরই দেবার কথা। আচ্ছা, আর আপনার সময় নষ্ট করব না। নমস্কার।' নোটগুলো টেবিলে রাখিয়া তিনি মক্কেল সহ ক্ষিপ্রবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ নোটগুলি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল—'ঘুষ কি করে দিতে হয় শিখলাম।' তারপর ভ্রূ বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল—'কেমন গল্প শুনলে ?'

বলিলাম—'আমার তো নেহাৎ অসম্ভব মনে হল না।'

'এরকম গল্প তুমি লিখতে পারো ? সাহস আছে ?'

'এমন অনেক সত্য ঘটনা আছে যা গল্পের আকারে লেখা যায় না, লিখলে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তবু যা সত্য তা সত্যই। Truth is stranger than fiction.'

তর্ক বেশ জমিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় দ্বারে আবার অতিথি সমাগম হইল। দরজা ভেজানো ছিল ; একজন

দরজার ফাঁকে মুণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া বলিল—'আসতে পারি স্যার ?' বলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাসিল।

অবাক হইয়া দেখিলাম, বিকাশ দত্ত। বছরখানেক আগে চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গে তাহার সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাহার হাসিটি অটুট আছে। কিন্তু বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় ধন-ভাগ্যে ভাঙন ধরিয়াছে।

ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া বিকাশকে বসাইল, হাসিয়া বলিল—'তারপর, খবর কি ?'

বিকাশ বলিল—'খবর ভাল নয় স্যার। চাকরি গেছে, এখন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর হইল—'চাকরি গেল কোন্ অপরাধে ?'

বিকাশ বলিল—'অপরাধ করলে তো ফাঁসি যেতাম স্যার। অপরাধ করিনি তাই চাকরি গেছে।'

'হুঁ। তা এখন কি করছেন ?'

'কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। অপনার হাতে যদি কিছু থাকে তাই খবর নিতে এলাম।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল—'কাজ—? আচ্ছা কাজের কথা পরে হবে, আজ বেলা হয়ে গেছে, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করুন।'

বিকাশের মুখে কৃতজ্ঞতার একটি ক্লিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল—'না, স্যার আমাকে দুপুরবেলা বাসায় ফিরতে হবে। যদি কিছু কাজ থাকে, ওবেলা আবার আসব।'

বিকাশের মুখ দেখিয়া মনে হইল তাহার বাসায় কোনও অভুক্ত প্রিয়জন তাহার পথ চাহিয়া আছে।

ব্যোমকেশ আবার একটু ভাবিয়া বলিল—'আমার হাতে একটা

কাজ আছে। সে কাজে আপনার মতন হুশিয়ার লোক চাই। একটি লোকের হাঁড়ির খবর জোগাড় করতে হবে।'

বিকাশ পকেট হইতে ডায়েরীর মত একটি খাতা ও পেন্সিল বাহির করিল—'নাম?'

ব্যোমকেশ বলিল—'শিউলী মজুমদারের নাম শুনেছেন?'

'শিউলী মজুমদার? গান গায়?'

'হ্যাঁ। তার বাপের নাম দয়ালহরি মজুমদার, ঠিকানা ১৩৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার। ওদের বাড়ির সব খবর সংগ্রহ করতে হবে।'

লিখিয়া লইয়া বিকাশ বলিল—'কবে খবর চান?'

ব্যোমকেশ বলিল—'একদিনের কাজ নয়। অনেকদিন ধরে একটু একটু ক'রে খবর জোগাড় করতে হবে। অতীতের খবর, বর্তমানের খবর, বাড়িতে কারা আসে যায়, কী কথা বলে সব খবর চাই। অনাদি হালদার আর প্রভাত—এই দুটো নাম মনে রাখবেন। যখনই কিছু খবর পাবেন আমাকে এসে জানাবেন।'

'বেশ, আজ তাহলে উঠি।' খাতা পেন্সিল পকেটে পুরিয়া বিকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ একটি একশত টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল—'আজ একশো টাকা রাখুন। কাজ হয়ে গেলে আরও পাবেন।'

নোট হাতে লইয়া বিকাশ কিছুক্ষণ অপলক চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, তারপর চোখ তুলিয়া বলিল—'ব্যোমকেশবাবু, পেটে ভাত না থাকলে মুখ দেখে ধরা যায়—না? আপনি ঠিক ধরেছেন।' খপ্ করিয়া ব্যোমকেশের পায়ের ধূলা লইয়া বিকাশ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া খামখেয়ালী গোছের হাসিল—'কিছু টাকার সদ্‌গতি হ'ল।—চল, আর দেরী নয়, নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক। নৈলে এখনি হয়তো আবার নতুন অতিথি এসে হাজির হবে।'

তের

অপরাহ্নে পুটিরাম যখন চা লইয়া আসিল তখন লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখখানা শীর্ণ ও বেদনাক্লিষ্ট। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রে, কি হয়েছে ?'

পুটিরাম বলিল—'আবার অম্বলের ব্যথা ধরেছে বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল—'আমি ওষুধ দিচ্ছি, তুই শুয়ে থাকগে যা। এ বেলা আর তোকে রাঁধতে হবে না।'

কিছুদিন হইতে পুটিরামকে অম্লশূলে ধরিয়াছে; বিশুদ্ধ কাঁকর এবং তেঁতুল বিচির গুঁড়া তাহার সহ্য হইতেছে না। ব্যোমকেশ তাহাকে যোয়ানের জল দিয়া ফিরিয়া আসিলে বলিলাম—'নীচে খবর পাঠাই, মেসেই আজ আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হোক।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল—না, চল আজ কোনও হোটেলে খেয়ে আসি। আজ পাঁচশো টাকা হাতে এসেছে, বর্বরস্য ধনক্ষয়ং হওয়া দরকার।'

আমি তাহার এই লঘুতায় সায় দিতে পারিলাম না, বলিলাম—'ব্যোমকেশ, কিছু মনে করো না। ওই পাঁচশো টাকা যে ঘুষ তা যখন বুঝতে পেরেছ তখন ও টাকা নেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল—'এ প্রশ্নের উত্তরে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে পারি কিন্তু তা করব না। টাকা আমার চাই তাই নিয়েছি, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।'

'কিন্তু ধরো—যদি শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে, নিমাই নিতাই খুন করেছে, তখন কি করবে ? ঘুষ খেয়ে কথাটা চেপে যাবে ?'

'না, চেপে যাব না, ওদেরই ধরিয়ে দেব। অবশ্য যদি পুলিস ধরতে চায়। মনে রেখো, অনাদি হালদারের খুনের তদন্ত করবার জন্যই ওরা আমাকে টাকা দিয়েছে, ঘুষ বলে দেয়নি।'

'তা যদি হয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা।'

'তোমার ভয় নেই, ঘুষ খেয়ে আমি অধর্ম করব না। অধর্ম করার মতলব যদি থাকত তাহলে পাঁচশো টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হতাম না, রীতিমত আখেরের রেস্ত করে নিতাম।' বলিয়া ব্যোমকেশ হাসিল।

চা শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইলাম। এ বেলা বোধহয় আর অতিথি অভ্যাগতের শুভাগমন হইবে না ভাবিতেছি, প্রভাত আসিয়া উপস্থিত। তাহার হাতে একটি বোঁচ্‌কা, চেহারা দেখিয়া বোঝা যায়, সম্প্রতি রোগ হইতে উঠিয়াছে, চোখের মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। ব্যোমকেশ বলিল—'আসুন। এখন শরীর কেমন?'

লজ্জিত হাসিয়া প্রভাত বলিল—'সেরে গেছে। সেদিন অনেক কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

'কিছু না। হাতে ওটা কি?'

'একটু মিষ্টি। ভীম নাগের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম কিছু নিয়ে যাই।'

বোঁচকা খুলিলে দেখা গেল, মিষ্টি অল্প নয়, প্রায় কুড়ি পঁচিশ টাকার কড়া পাকের সন্দেশ। সেদিন ব্যোমকেশ তাহার উপকার করিয়াছিল, ডাক্তার, গাড়ি-ভাড়া প্রভৃতির খরচ লয় নাই, তাই প্রভাত অত্যন্ত শিষ্টভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে চায়। ব্যোমকেশ উল্লসিত হইয়া বলিল—'আরে আরে, এ যে স্বর্গীয় ব্যাপার। অজিত, আজ কার মুখ দেখে আমরা উঠেছিলাম বল তো?'

বলিলাম—'যতদূর মনে পড়ে তুমি আমার মুখ দেখেছিলে এবং আমি তোমার মুখ দেখেছিলাম।'

'তবেই বোঝো, আমাদের মুখ দুটো সামান্য নয়। যাহোক, খাবারগুলো সরিয়ে রাখা ভাল, বাইরে ফেলে রাখা কিছু নয়।' ব্যোমকেশ সন্দেশগুলি ভিতরে রাখিয়া আসিয়া বলিল—'প্রভাতবাবু, চা খাবেন নাকি?'

'আজ্ঞে না, আমি চা খেয়ে এসেছি।' সে ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—'এখানে কেবল আপনারা দু'জনে থাকেন বুঝি?'

ব্যোমকেশ বলিল—'উপস্থিত দু'জনেই আছি। আমার স্ত্রী এবং ছেলে এখন পাটনায়।'

প্রভাতের চোখ দুটা যেন নৃত্য করিয়া উঠিল—'পাটনায়।'

ব্যোমকেশ বলিল—'হ্যাঁ, যা হাঙ্গামা চলেছে, তাদের বাইরে রেখেছি। আপনি বুঝি পাটনা এখনও ভুলতে পারেন নি?'

'পাটনা ভুলব!' প্রভাতের স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল—'জন্মে' অব্দি পাটনাতেই কাটিয়েছি। কত বন্ধু আছে সেখানে। ইশাক সাহেব আছেন।'

'ইশাক সাহেব?'

'আমার ওস্তাদ। তাঁর দোকানে চাকরি করতাম, তিনি হাতে ধরে আমাকে দপ্তরীর কাজ শিখিয়েছিলেন। এমন ভাল লোক হয় না, দেবতুল্য লোক। এখন বুড়ো হয়েছেন···কে তাঁর দোকানে কাজ করছে কে জানে···হয়তো তিনি একাই কাজ করছেন।' প্রভাত নিশ্বাস ফেলিল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞসা করিল—'পাটনায় কোন্ পাড়ায় থাকেন তিনি?'

সিটিতে থাকেন। সেখানে সকলেই তাঁকে চেনে। আমার আর ওদিকে যাওয়া হয়নি, সেই যে পাটনা থেকে এসেছি, আর

যাইনি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি নিশ্চয় মাঝে মাঝে পাটনা যান? এবার যখন যাবেন ইশাক সাহেবকে দেখে আসবেন? কেমন আছেন তিনি—বড় দেখতে ইচ্ছে করে।'

'নিশ্চয় দেখা করব। তারপর এদিকের খবর কি? কেষ্টবাবু কেমন আছেন?'

প্রভাত বলিল—'কেষ্টবাবু চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার বাসায় ওঁর পোষাল না। মার সঙ্গে দিনরাত খিটিমিটি লাগত। তারপর একদিন নিজেই চলে গেলেন।'

'যাক, আপনার ঘাড় থেকে একটা বোঝা নামল।—আর নৃপেন-বাবু? তিনি কি আপনার দোকানে কাজ করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি কাজ করেন?'

'বইয়ের দোকানে অনেক ছুটোছুটির কাজ আছে। অন্য দোকান থেকে বই আনতে হয়, ভি পি পাঠাবার জন্যে পোষ্ট অফিসে যেতে হয়। এসব কাজ আগে আমাকেই করতে হত। এখন নৃপেনবাবু করেন।'

'ভাল।'

প্রভাত এতক্ষণ ব্যোমকেশের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাইতেছিল; এখন সে আমার দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিল—'অজিতবাবু, আমি আপনার কাছে আসব বলেছিলাম মনে আছে বোধহয়। এইসব গণ্ডগোলে আসতে পারিনি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।'

'কি অনুরোধ বলুন।'

'আপনার একখানি উপন্যাস আমাকে দিতে হবে। আমি

গরীব প্রকাশক, নতুন দোকান করেছি। তবু অন্য প্রকাশকদের কাছ থেকে আপনি যা পান আমিও তাই দেব।'

নূতন প্রকাশককে বই দেওয়ায় বিপদ আছে, কখন লালবাতি জ্বালিবে বলা যায় না। একবার এক অর্বাচীনকে বই দিয়া ঠকিয়াছি। আমি ইতস্তত করিয়া বলিলাম—'তা—এখন তো আমার হাতে কিছু নেই—'

ব্যোমকেশ বলিল—'কেন, যে উপন্যাসটা ধরেছ সেটা দিতে পারো। প্রভাতবাবু, আপনি ভাববেন না, অজিতের বই আপনি পাবেন।'

প্রভাত উৎসাহিত হইয়া বলিল—'যখন আপনার বই শেষ হবে তখন দেবেন। এখন আমার দোকান ভাল চলছে না, পরের বই কমিশনে বিক্রী করে কতটুকুই বা লাভ থাকে। আপনাদের আশীর্বাদ পেলে আমি দোকান বড় করে তুলব; প্রাণপণে খাটব, কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না।'

ব্যোমকেশ বলিল—'এই তো চাই। আপনাদের বয়সে কাজে উৎসাহ থাকা চাই। তবে উন্নতি করতে পারবেন।'

প্রভাত গদ্গদ মুখে পকেট হইতে মনি-ব্যাগ বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি নোট লইয়া আমার সম্মুখে রাখিল। দেখিলাম দুইশত টাকা। সত্যই আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম!

প্রভাত বলিল—'অগ্রিম প্রণামী দিলাম। বই লেখা শেষ হলেই বাকি টাকা দিয়ে যাব।' সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম—'রসিদ নিয়ে যান।'

সে বলিল—'না না, এখন রসিদ থাক, সব টাকা দিয়ে রসিদ নেব। আজ যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও দোকান খোলা হয়নি।'

প্রভাত প্রস্থান করিলে আমরা কিছুক্ষণ বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে পরস্পর চাহিয়া রহিলাম। তারপর নোট দুটি সস্নেহে পকেটে

রাখিয়া বলিলাম—'কাণ্ডখানা কি ! এ যে শ্রাবণের ধারার মত ক্রমাগত একশো টাকার নোট বৃষ্টি হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল—'হুঁ। এত সুখ সইলে হয় !'

এই সময় দ্বারদেশে বাঁটুলের আবির্ভাব হইল। তাহার আবার চাঁদা আদায়ের সময় হইয়াছে। সে ভক্তিভরে আমাদের প্রণাম করিয়া বলিল—'চাঁদাটা নিতে এলাম কর্তা।'

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির অর্থ ঃ জীবন-ব্যবসায়ে শুধু আমদানি নয়, রপ্তানিও আছে।

বাঁটুলকে বসাইয়া ব্যোমকেশ টাকা আনিতে গেল। কামিনী-কান্তর দেওয়া নোটগুলি হইতে একটি আনিয়া বাঁটুলকে দিল—'ভাঙানি আছে বাঁটুল ?'

'আজ্ঞে আছে।'

বাঁটুল কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিল। বেশ পরিস্ফুট গেঁজে ; তাহাতে খুচরা রেজগি হইতে নানা অঙ্কের নোট পর্যন্ত রহিয়াছে। কয়েকটি একশত টাকার নোটও চোখে পড়িল। বাঁটুল হিসাব করিয়া ভাঙানি ফেরৎ দিল, তারপর গেঁজে আবার কোমরে বাঁধিল। বাঁটুলের ব্যবসা যে লাভের ব্যবসা তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বাঁটুলকে সিগারেট দিল—'বাঁটুল, অনাদি হালদার মারা গেছে শুনেছ বোধহয় ?'

বাঁটুল চোখ তুলিল না, সযত্নে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল —'আজ্ঞে, শুনেছি।'

'কেউ তাকে গুলি করে মেরেছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই তো গুজব।'

'তুমি তো অনেক খবর টবর রাখো, কে মেরেছে আন্দাজ করতে পারো না ?'

'কলকেতায় লাখ লাখ লোক আছে কর্তা, তার মধ্যে কে মেরেছে কি করে আন্দাজ করব। তবে এ কথাও বলতে হয়, উনি চুল্‌কে ঘা করলেন। আমার চাঁদা বন্ধ না করলে বেঘোরে প্রাণটা যেত না। আমি রক্ষে করতাম।'

'বটেই তো! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা কি উচিত! অনাদি হালদারের দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। তা সে যাক। বাঁটুল, তোমরা রাইফেল ভাড়া দাও?'

'আজ্ঞে দিই।'

'কি রকম শর্তে ভাড়া দাও?'

'আজ্ঞে ভাড়া একদিনের জন্যে কুল্লে পঁচিশ টাকা; রাইফেল আর দুটি টোটা পাবেন। তবে ভাড়া নেবার সময় তিনশো টাকা জমা দিতে হয়, রাইফেল ফেরৎ দিলে ভাড়া কেটে নিয়ে টাকা ফেরৎ দিই। আপনাদের চাই নাকি কর্তা?'

'না, উপস্থিত দরকার নেই, দরটা জেনে রাখলাম। আচ্ছা বাঁটুল, যে রাত্রে অনাদি হালদার খুন হয় সে রাত্রে কাউকে রাইফেল ভাড়া দিয়েছিলে?'

বাঁটুল উঠিয়া দাঁড়াইল—'আজ্ঞে কর্তা, সে কথা বলতে পারব না। একজন খদ্দেরের কথা আর একজনকে বললে বেইমানী হয়, আমাদের ব্যবসা চলে না। আচ্ছা, আজ আসি। পেন্নাম হই।'

বাঁটুল চলিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় লম্বা হইয়া বোধ করি ঝিমাইয়া পড়িল। আমার মনটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া দুইশত টাকার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। টাকা যখন লইয়াছি তখন উপন্যাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে। অথচ তাড়াহুড়া করিয়া আমার লেখা হয় না; মনটা যখন নিশ্চিন্ত নিস্তরঙ্গ হয় তখনই কলম চলে। উপন্যাসের

কথাই ভাবিতে লাগিলাম। তাহার মধ্যে নিমাই নিতাই প্রভাত বাঁটুল সকলেই মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে পেটে ক্ষুধার উদয় হইলে বলিলাম—'চল এবার, বেরুনো যাক। হোটেলের খরচ আজ না হয় আমিই দেব।'

ব্যোমকেশ বলিল—'সাধু সাধু।'

আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি হোটেল আছে। দোতলার উপর হোটেল, সরু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়; সিঁড়ির মাথায় স্থূলকায় ম্যানেজার টেবিলের উপর ক্যাশ-বাক্স লইয়া বসিয়া থাকেন। আশে পাশে ছোট ছোট কুঠুরীতে টেবিল পাতা। বিশেষ জাঁক-জমক নাই, কিন্তু রান্না ভাল।

হোটেলে উপস্থিত হইলে ম্যানেজার বলিলেন—'পাঁচ নম্বর।' অমনি একজন ভৃত্য আসিয়া আমাদের পাঁচ নম্বর কুঠুরীর দিকে লইয়া চলিল। একটি গলির দুই পাশে সারি সারি কুঠুরী; যাইতে যাইতে একটি কুঠুরীর সম্মুখে গিয়া পা আপনি থামিয়া গেল। আমি ব্যোমকেশের গা টিপিলাম। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে, কেষ্টবাবু একাকী বসিয়া আহার করিতেছেন। তাঁহার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর পাট-করা শাল, মুখে ধনগর্বের গাম্ভীর্য। তাঁহার সামনে শ্বেতবস্ত্রাবৃত টেবিলের উপর অনেকগুলি প্লেটে রাজসিক খাদ্যদ্রব্য সাজানো; একটি প্লেটে আস্ত রোস্ট্ মুরগি উত্তানপাদ অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। পাশে একটি বোতল।

কেষ্টবাবু পানাহারে মগ্ন, দরজার বাহিরে আমাদের লক্ষ্য করিলেন না। আমরা পাশের প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলাম।

ভৃত্যকে অর্ডার দিলে সে খাবার লইয়া আসিল; আমরা খাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশের প্রাকৃতন প্রসন্নতা আর নাই, সে যেন ভাল ভাল খাদ্যগুলি উপভোগ করিতেছে না।

আধ ঘণ্টা পরে ভোজন শেষ করিয়া কোটর হইতে নির্গত হইলাম ম্যানেজারের টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেষ্টবাবু হোটেলের ঋণ শোধ করিতেছেন। রাজকীয় ভঙ্গীতে পকেট হইতে একশত টাকার নোট লইয়া তিনি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

এই লইয়া আজ চারবার একশত টাকার নোট দেখিলাম। দেশটা সম্ভবত রাতারাতি বড়মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ বিদায় লইবার পূর্বেই আমাদের কপাল ফিরিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের আর দেরি নাই।

ম্যানেজার ভাঙানি ফেরত দিলেন, কেষ্টবাবু তাহা অবজ্ঞাভরে পকেটে ফেলিয়া পিছন ফিরিলেন। আমরা পিছনেই ছিলাম।

চোখাচোখি হইল। কেষ্টবাবুর চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল। তার-পর তিনি পাকশাট খাইয়া ঝটিতি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

আমরা যখন হোটেলের প্রাপ্য চুকাইয়া পথে নামিলাম কেষ্টবাবু তখন অদৃশ্য হইয়াছেন।

বাসার দিকে চলিতে চলিতে বলিলাম—'আজকের দিনটা ঘটনা-বহুল বলা চলে, এমন কি টাকাবহুল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ যেন চারিদিকে একশো টাকার নোটের হরির লুট হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

আরও খানিকদূর চলিবার পর বলিলাম—'কী ভাবছ এত ?'

ব্যোমকেশ বলিল—'চল অজিত, পাটনা যাই। সকালে একটা ট্রেন আছে।'

আমি ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িলাম—'পাটনা যাবে! আর এদিকে ?'

'এদিকে আর কিছু করবার নেই।'

'তার মানে অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে তা বুঝতে পেরেছ !'

'বোধহয় পেরেছি। কিন্তু তাকে ধরবার উপায় নেই।'

আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম—'কে খুন করেছে?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিল; বুঝিলাম আবোল তাবোল আবৃত্তি করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বলিলাম—'বলতে না চাও বোলো না। কিন্তু—বিকাশ দত্তকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে টাকা দিয়েছ তার কি হবে?'

'বিকাশ ওস্তাদ ছেলে, জানাবার মত খবর থাকলে সে ঠিক আমাকে জানাবে।'

'কিন্তু আসল খবর যখন জানতেই পেরেছ তখন আর খবরে দরকার কি?'

'দরকার হয়তো নেই, কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। সুন্দরী যুবতীরা প্রসাধন করেন কেন? বল্কল পরে থাকলেই পারেন। থাকেন না তার কারণ—অধিকন্তু ন দোষায়।'

'তুমি কি সুন্দরী যুবতী?'

'না, আমি সুন্দর যুবক। আমার জন্যে আমার বৌয়ের মন কেমন করছে। সুতরাং আর দেরি নয়। কাল সকালেই—পাটনা।'

চৌদ্দ

আমাদের পাটনা যাত্রার পর হইতে স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত এই কয় মাস আমাদের জীবনের ধারাবাহিকতা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে পড়িয়া অনাদি হালদার ঘটিত ব্যাপারের খেই হারাইয়া গিয়াছিল। এই কাহিনীতে সে সকল অবান্তর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি অনাবশ্যক, কেবল সংক্ষেপে এই আট-নয় মাস কি করিয়া কাটিল তাহার একটা আন্দাজ দিয়া নির্দিষ্ট বিষয়ে ফিরিয়া যাইব।

পাটনায় পৌঁছিয়া দশ বারোদিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল; তারপর একদিন পুরন্দর পাণ্ডের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পাণ্ডেজী বছর খানেক হইল বদলি হইয়া পাটনায় আসিয়াছেন। সেই যে দুর্গ রহস্য সম্পর্কে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তারপর দেখা হয় নাই। পাণ্ডেজী খুশী হইলেন, আমরাও কম খুশী হইলাম না। পাণ্ডেজী মৃত্যু-রহস্যের অগ্রদূত, আমাদের সহিত দেখা হইবার দু'একদিন পরেই একটি রহস্যময় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশকেই সে রহস্য ভেদ করিতে হইল। একদিন সে কাহিনী বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শুধু যে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল তাহা নয়, সারা ভারতবর্ষের জীবনে এক মহা সন্ধিক্ষণ দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। স্বাধীনতা আসিতেছে, রক্তাক্ত দেহে বিক্ষত চরণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ভেদ করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা যখন আসিবে হয়তো মুমূর্ষু রক্তহীন দেহে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে হৃদয়রক্ত নিঙড়াইয়া দিতে হইবে। তবু স্বাধীনতা আসিতেছে; স্বার্থ-নিষ্ঠুর বিদেশী

শাসকের খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হইয়াও হয়তো বাঁচিয়া থাকিবে। আশা আশঙ্কায় কম্পমান সেই দিনগুলির কথা স্মরণ হইলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

একদিন বৈকালে ময়দানে বেড়াইতে বেড়াইতে কৈশোরের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পরিধানে শেরওয়ানী পায়-জামা সত্ত্বেও চিনিতে পারিলাম—স্কুলে যাহার সহিত প্রাণের বন্ধুত্ব ছিল সেই ফজলুর রহমান। দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম এবং সবেগে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলাম।

'ফজলু!'

'অজিত!'

কিছুক্ষণ পরে বাহু বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমি দুই পা পিছাইয়া আসিলাম, ফজলুর দিকে গলা বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, —'নে ফজলু, ছুরি বার কর। এই গলা বাড়িয়ে রয়েছি।'

ফজলু নিজের হাতের মোটা লাঠিটা আমার হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল—'এই নে লাঠি, দিয়ে দে আমার মাথায়। তোদের অসাধ্য কাজ নেই।'

তারপর আমরা ঘাসের উপর বসিলাম, ব্যোমকেশের সহিত ফজলুর পরিচয় করাইয়া দিলাম। ফজলু এখন পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছে, প্রচণ্ড পাকিস্তানী। সুতরাং তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল, কেহই কাহাকেও রেয়াৎ করিলাম না। শেষে ফজলু বলিল—'ব্যোমকেশবাবু, অজিতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, ওর ঘটে কিচ্ছু নেই। কিন্তু আপনি তো বুদ্ধিজীবী মানুষ, আপনি বলুন দেখি দোষ কার—হিন্দুর না মুসলমানের।'

ব্যোমকেশ বলিল—'এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।'

সেদিন বেড়াইয়া ফিরিতে দেরী হইয়া গেল। তারপর আরও

কয়েকদিন ফজলুর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের খাওয়াইয়াছিল। তারপর—

উন্মত্ত হিংসার পিশাচ-নৃত্য আবার শুরু হইয়া গেল। প্রথমে নোয়াখালি, তারপর বিহার। এ লইয়া বাক-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ফজলু এই হিংসা-যজ্ঞে প্রাণ দিল। সে সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষ ছিল, যাহা বিশ্বাস করিত তাহা গলা ছাড়িয়া প্রচার করিত; তাই বোধ হয় তাহাকে প্রাণ দিতে হইল। কিছুদিন পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হইলে আমরা পাটনা সিটিতে ইশাক সাহেবের খোঁজ লইতে গিয়াছিলাম। তিনিও গিয়াছেন; কেবল তাঁহার দোকানটা অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।

কিন্তু যাক। এবার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে বিকাশ দত্তর চিঠি আসিয়াছিল; বিকাশ লিখিয়াছিল—

'প্রণাম শতকোটি, পুঁটিরামের কাছে আপনার ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখছি। আশা কার আপনি শীঘ্রই ফিরবেন।

আমি এখন মাস্টারি করছি। দয়ালহরি মজুমদারের একটা আট-নয় বছরের অকালপক্ব ছেলে আছে, তাকে পড়াই। মাইনে পাঁচ টাকা, সকাল বিকেল পড়াতে যাই। ছেলেটা হাড় বজ্জাৎ; এমন ইঁচড়ে পাকা মিটমিটে শয়তান আমিও আজ পর্যন্ত দেখিনি। বাড়িতে কে কি করছে, কোথায় কি ঘটছে, সব খবর সে রাখে।

দয়ালহরি মজুমদার ঢাকার লোক; সেখানে বীমার দালালী এবং আরও কি কি করত। বছর খানেক আগে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের আঁচ পেয়ে আগে ভাগেই কলকাতা পালিয়ে এসেছিল।

মেয়ে এবং ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। লোকটা সন্দিগ্ধ এবং ধড়িবাজ।

মেয়ে শিউলী শান্ত এবং ভাল মানুষ গোছের। বাইরে থেকে মনে হয় বিদ্যেধরী, কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল গাইতে পারে, রাতদিন গান বাজনা নিয়ে আছে। গ্রামোফোনে গান দিয়েছে, তা ছাড়া টাকা নিয়ে সভাসমিতিতে গাইতে যায়। শিউলীর উপার্জন থেকে বোধ হয় সংসার চলে। বুড়োটা কিছু কাজকর্ম করে না।

আপনি অনাদি হালদার আর প্রভাত এই দুটো নাম মনে রাখতে বলেছিলেন। অনাদি হালদারের খবর পাইনি, প্রভাতের খবর পেয়েছি। কয়েক মাস আগে প্রভাতের সঙ্গে শিউলীব বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তারপর সম্বন্ধ ভেঙে যায়। কেন ভেঙে যায় তা জানতে পারিনি, তবে সন্দেহ হয় কোনও গুপ্ত কথা আছে। বিয়ে ভেঙে যাবার আগে প্রভাত ঘন ঘন আসত, বিয়ে ভেঙে যাবার পরও একবার এসেছিল। দয়ালহরি মজুমদার তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

উপস্থিত বাড়িতে একজন লোকের খুব যাতায়াত আছে, তার নাম জগদানন্দ অধিকারী। শিউলীকে গান শেখাবার ছুতো করে আসে। লোকটার মৎলব ভাল নয়। গান শেখানো ছাড়া অন্যভাবে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়।

আপাতত এই পর্যন্ত। নতুন খবর পেলে জানাবো। আপনি কবে ফিরবেন। আমার ঠিকানা নীচে দিলাম।

প্রণামান্তে বিকাশ দত্ত।'

বিকাশের চিঠিতে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই। আমাদের জানা কথাই পরিকীর্ণ হইয়াছে।

এদিকে পাটনায় আমাদের অনেকদিন হইয়া গেল। কলিকাতায়

ফিরিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় দিল্লী হইতে ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিল। সর্দার বল্লভভাই পাটেল তাহার সহিত দেখা করিতে চান।

সর্দার বল্লভভাই কি করিয়া ব্যোমকেশের নাম জানিলেন, কেন তাহার সাক্ষাৎ চান, কিছুই জানা গেল না। রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘন ঘটা, অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে বজ্রবিদ্যুৎ। ব্যোমকেশ আমাকে পাটনায় ফেলিয়া একাকী দিল্লী চলিয়া গেল।

দিল্লী গিয়া ব্যোমকেশ কি করিয়াছিল তাহা পুরোপুরি জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সে ফিরিয়া আসিবার পর ইসারা ইঙ্গিতে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করার এ স্থান নয়। দেশ তখনও নিজের হাতে আসে নাই, ইহারই মধ্যে গুপ্ত ঘরভেদীরা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, কে দেশের শত্রু কে মিত্র নিশ্চয়ভাবে জানার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্যোমকেশ চলিয়া গেলে আমি একলা পড়িয়া গেলাম। দূরে রণবাদ্য শুনিয়া আস্তাবলে বাঁধা লড়ায়ে-ঘোড়ার যে অবস্থা হয় আমার অবস্থাও কতকটা সেই রকম দাঁড়াইল। এইভাবে পাটনায় যখন আর মন টিকিল না তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু কলিকাতার বাসা শূন্য। ভাবিয়াছিলাম, নিরিবিলিতে উপন্যাসে মন বসাইতে পারিব, কিন্তু মন বসিতে চাহিল না। প্রভাতের নিকট হইতে টাকা লইয়াছি, একটা কিছু করা দরকার —এই সঙ্কল্পটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল।

একদিন প্রভাতের দোকানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া সে গলা উঁচু করিয়া বলিল, 'পাটনা থেকে কবে ফিরলেন? আমি মাঝে আপনাদের বাসায় গিয়েছিলাম। ঈশাক সায়েবের খবর নিয়েছিলেন?'

ঈশাক সাহেবের খবর বলিলাম। প্রভাত কিছুক্ষণ অচল হইয়া

বসিয়া রহিল, তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে লাগিল। আমি সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম না, আবার দেখা হইবে বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রভাতের চিঠি লইয়া নৃপেন আসিল। চিঠিতে দু'ছত্র লেখা—

মাননীয়েষু, কাল কোনও কথা হইল না, সেজন্য লজ্জিত। ব্যোমকেশবাবু কি ফিরিয়াছেন?

উপন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আশা করি অগ্রসর হইতেছে। ইতি নিবেদক প্রভাত রায়।

নৃপেনকে বলিলাম—ব্যোমকেশ এখনও ফেরেনি।—আপনি এখনও প্রভাতবাবুর দোকানেই কাজ করছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আছেন কোথায়?'

'পুরানো বাসাতেই আছি। প্রভাতবাবু থাকতে দিয়েছেন।'

'ননীবালা দেবীর সঙ্গে বেশ বনিবনাও হচ্ছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'ওদিকের খবর কি? নিমাই নিতাই?'

'ওরা আদালতের হুকুম পেয়েছে। আমাদের বাসায় অনাদি-বাবুর যে সব জিনিষ ছিল সব তুলে নিয়ে গেছে, আলমারিও নিয়ে গেছে।'

'পুলিসের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ পেয়েছেন?'

'কিছু না।'

'কেষ্টবাবুর খবর কি?'

'জানি না। সেই যে বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তারপর আর দেখিনি।'

নৃপেন চলিয়া গেল।

উপন্যাস লইয়া বসিলাম। কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত, তাহাকে কলমের ডগায় ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না। আরও কয়েকদিন ছটফট্ করিয়া পাটনায় ফিরিয়া গেলাম।

ব্যোমকেশ দিল্লী হইতে ফিরে নাই। গোটা দুই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোষ্ট কার্ড আসিয়াছে—ভাল আছি, ভাবনা করিও না। কবে ফিরিব স্থিরতা নাই।

এদিকে স্বাধীনতা দিবস অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দেশ অভাবনীয় সম্ভাবনার আশায় যেন দিশাহারা হইয়া গিয়াছে।

আগষ্ট মাসের দশ তারিখে হঠাৎ ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিল।

রোগা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শুষ্ক মুখে বিজয়ীর হাসি। বলিল—'আর না, চল কলকাতায় ফেরা যাক। পুঁটিরামকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দাও।'

পনেরো

ইচ্ছা ছিল সত্যবতী ও খোকাকে লইয়া একসঙ্গে কলিকাতায় ফিরিব—সত্যবতীও এতদিন বাহিরে বাহিরে থাকিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য দড়িছেঁড়া হইয়াছিল—কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। পাটনায় দীর্ঘকাল থাকার ফলে বেশ একটি সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা গুটাইয়া লইবার ভার একা সুকুমারের ঘাড়ে চাপাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলাম না। কথা হইল হপ্তাখানেক পরে সুকুমার সত্য-বতীদের লইয়া ফিরিবে, আমরা আগে গিয়া বাসাটা সাজাইয়া গুছাইয়া সত্যবতীর উপযোগী করিয়া রাখিব।

১৩ই আগষ্ট প্রত্যূষে আমি ও ব্যোমকেশ কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

তখনও সূর্যোদয় হয় নাই। বাসার সম্মুখে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দেখি আমাদের সদর দরজার সামনে ভিড় জমিয়াছে। ভিড়ের মধ্যে পুঁটিরামকেও দেখা গেল। ব্যাপার কি! আমরা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি মৃতদেহ ফুটপাতে পড়িয়া আছে, পিঠের বাঁ দিকে রক্তের দাগ শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিহীন চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া খোলা।

চিনিতে কষ্ট হইল না—কেষ্টবাবু।

এখনও পুলিস আসিয়া পৌঁছে নাই। আমরা ভিড়ের বাহিরে আসিলাম, পুঁটিরামকে ডাকিয়া লইয়া উপরে চলিলাম। ব্যোম-কেশের মুখ লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখে চাপা আগুন।

নিজেদের বসিবার ঘরে গিয়া দু'জন উপবিষ্ট হইলাম। কেষ্ট-বাবুর হঠাৎ ভাগ্যোন্নতি যে এইরূপ পরিণতি লাভ করিবে তাহা কে

ভাবিয়াছিল। আমি বলিলাম—'আমার ধারণা হয়েছিল কলকাতায় সম্মুখ-সমর বন্ধ হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল—'এটা সম্মুখ সমর নয়, কেষ্টদাসকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে।—পুঁটিরাম, তুই চিনতে পারলি ?'

পুঁটিরাম বলিল—'আজ্ঞে চিনেছি, উনি সেই ভেট্‌কিমাছবাবু। কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিলেন, আপনার কথা জিগ্যেস করলেন।'

'কাল সন্ধেবেলা এসেছিল ?'

'আজ্ঞে। আমি বললাম, চিঠি পেয়েছি বাবুরা কাল সকালে আসবেন। তখন তিনি চলে গেলেন।'

'হুঁ, আচ্ছা পুঁটিরাম তুই চা তৈরি কর গিয়ে।'

ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় পা ছড়াইয়া কড়িকাঠের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া রহিল। আমি জানালায় গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম ফুটপাথে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছে, ভিড় সরিয়া গিয়াছে কেষ্টবাবুকে একটা মোটর ভ্যানে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। পুলিস কেষ্টবাবুর নাম ধাম জানিতে পারিল কিনা বোঝা গেল না। তাহারা লাস লইয়া চলিয়া গেল।

চা আসিল। ব্যোমকেশ চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিল—'লাস দেখে মনে হয় শেষরাত্রির দিকে—রাত্রি তিনটে-চারটের সময়—কেষ্টদাস খুন হয়েছে। প্রথম যেদিন কেষ্টবাবু আমার কাছে আসে সেও রাত্রি তিনটে-চারটের সময়। কিন্তু তখন একটা কারণ ছিল, আজ এতরাত্রে কি জন্যে আসছিল ?'

বলিলাম—'তোমার কাছেই আসছিল তার প্রমাণ কি ? মাতাল দাঁতাল মানুষ—হয়তো এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল, গুণ্ডা ছুরি মেরেছে—'

'না এতবড় সমাপতন সম্ভব নয়, কেষ্টদাস আমার কাছেই আসছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল, আমি নেই শুনে ফিরে গিয়েছিল। তারপর রাত্রে এমন কিছু ঘটল যে সে সকাল পর্যন্ত

অপেক্ষা করতে পারল না—' ব্যোমকেশ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল —'ভেবেছিলাম অনাদি হালদারের ব্যাপারটা ভুলে যাব, কিন্তু এরা ভুল্‌তে দিলে না।'

'অনাদি হালদারেব সঙ্গে কেষ্টবাবুর মৃত্যুর সম্বন্ধ আছে নাকি ?'

ব্যোমকেশ আমার প্রতি একটি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর আরাম কেদারায় লম্বা হইল।

বেলা আটটা নাগাদ বিকাশ দত্ত আসিল। তাহার আর সেই অন্তঃশূন্য চুপসানো ভাব নাই; আমাদের দেখিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—'এই যে আপনারা এসে গেছেন স্যার! আমি পাটনায় চিঠি লিখতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখে যাই। কিছু নতুন খবব আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল—'বসুন, খবর শুনব। নিজের কথা আগে বলুন। আট-নয় মাস বাইরে ছিলাম, আপনার অসুবিধে হয়নি তো ?'

বিকাশ বলিল—'অসুবিধে একটু হয়েছিল স্যার। কিন্তু সে কিছু নয়। এখন সাম্‌লে নিয়েছি। তিন মাইল ঘাস কিনেছি, তাতেই চলে যাচ্ছে।'

'তিন মাইল ঘাস !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

বিকাশ তিন মাইল ঘাসের রহস্য প্রকাশ করিল। রেল লাইনের দুধারে যে ঘাস জন্মায়, রেলের কর্তৃপক্ষ নাকি তাহা প্রতি বৎসর জমা দিয়া থাকেন বিকাশ তিন মাইল ঘাস জমা লইয়াছে এবং গোয়ালাদের সেই ঘাস বিক্রয় করিতেছে। বিকাশের কোন কষ্ট নাই, গোয়ালারা অগ্রিম পয়সা দিয়া গরু মোষ চরায়; বিকাশের কিছু লাভ থাকে।

বিকাশ বলিল—তাছাড়া চাকরিটা বোধ হয় এবার ফিরে পাব স্যার।'

ব্যোমকেশ বলিল—'বেশ বেশ, এবার কি নতুন খবর আছে বলুন। আপনার ছাত্রকে আজ সকালে পড়াতে যাননি ?'

বিকাশ বলিল—'পড়াব কাকে স্যার ? পাখী উড়েছে।'

'সে কি ?'

'সেই খবরই তো দিতে এলাম। গোড়ার দিক থেকে বলব, না শেষের দিক থেকে ?'

'গোড়ার দিক থেকে বলুন।'

বিকাশ তখন তক্তাপোশের উপর ভবিষ্যযুক্ত হইয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'চিঠিতে আপনাকে যে সব খবর দিয়েছিলাম তারপর আর নতুন খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। ঢিমে-তেতালায় চলছিল, তবু লেগে রইলাম। বসে না থাকি বেগার খাটি। মাস খানেক আগে জানতে পারলাম দয়ালহরি মজুমদারের নামে একজন পাঁচ-হাজার টাকার মামলা ঠুকে দিয়েছে। দয়ালহরি বুড়োর ভাবগতিক দেখে মনে হল সে কেটে পড়বার মতলবে আছে। দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন প্রভাত এসে উপস্থিত। প্রভাতকে আগে দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। বুড়ো তাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না, তারপর ঘরে এনে বসালো। দোর বন্ধ করে কথাবার্তা হল, আমি জানলায় কান লাগিয়ে শুনলাম। প্রভাত বলছে, আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিচ্চি—দোকান বাঁধা রেখে যেখান থেকে হোক পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করব—আপনি হ্যাণ্ডনোটের টাকা শোধ করে দিন। বুড়ো পাঁচ হাজার টাকার বদলে প্রভাতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হল।

'এদিকে গদানন্দর সঙ্গে—ভাল কথা, জগদানন্দ অধিকারীর ডাক-নাম গদানন্দ—শিউলীর ভেতরে ভেতরে কিছু চলছিল। গদানন্দ

সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, মেয়ে ধরা ওর পেশা, বেটা দালাল। সে যাহোক, হপ্তাখানেক পরে প্রভাত একটা ছোট্ট অ্যাটাচি-কেস্ হাতে নিয়ে এল ; বুঝলাম টাকা এনেছে। তারপর জানলায় কান লাগিয়ে শুনলাম, বুড়ো বলছে—তুমি ভাল ছেলে, অনাদি হালদার তোমার নামে মিছে কথা বলেছিল। আমি তোমার সঙ্গে শিউলীর বিয়ে দেব। কিন্তু শ্রাবণ মাসে আর বিয়ের দিন নেই, অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হবে। প্রভাত খুশী হয়ে চলে গেল।

'তারপর কি ব্যাপার' হল জানি না, গত ৭ই আগষ্ট পড়াতে গিয়ে শুনলাম গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে উধাও হয়েছে। বুড়োর সাজিশ ছিল কিনা বলতে পারি না, আমার বিশ্বাস বুড়োই নাটের গুরু। যাহোক, সেদিন সন্ধ্যেবেলা প্রভাত এল। খুব খানিকটা চেঁচামেচি হল। প্রভাত টাকা ফেরৎ চাইল, বুড়ো হাত উল্টে বলল —টাকা কোথায় পাব, শিউলী আর গদানন্দ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। প্রভাত রাগে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে গেল। বেচারার জাতও গেল পেটও ভরল না।

'কাল সকালবেলা পড়াতে গিয়ে দেখি বাড়ির দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ নেই। বুড়ো ছেলেটাকে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

গল্প শেষ করিয়া বিকাশ একটা বিড়ি ধরাইয়া ফেলিল, বলিল— 'এসব খবর আপনার কাজে লাগবে কিনা জানি না স্যার, কিন্তু এর বেশী আর কিছু জোগাড় করা গেল না।'

'সব খবর কাজের খবর,—ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর চোখ খুলিয়া বলিল—'গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে কোথায় গেছে আপনি জানেন না বোধহয় ?'

'না। যদি বলেন খুঁজে বার করতে পারি।'

ব্যোমকেশ একটু মৌন থাকিয়া বলিল—'আর একটা কাজ আপনাকে করতে হবে—'

এই সময় দরজায় টোকা পড়িল।

দ্বার খুলিয়া দেখি প্রভাত। তাহার চুল উস্কখুস্ক, মুখ শীর্ণ, চোখ-ভরা ক্লান্তি। তাহাকে দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'আসুন, প্রভাত-বাবু, আমরা ফিরেছি খবর পেলেন কোত্থেকে?'

প্রভাত চেয়ারে বসিল। বিকাশকে সে লক্ষ্যই করিল না; বিকাশও তক্তাপোশের এক কোণে এমনভাবে গুটিসুটি হইয়া বসিল যে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রভাত বলিল—'খবর পাইনি, দেখতে এলাম যদি এসে থাকেন।'

ব্যোমকেশ বলিল—'বেশ। কেষ্টবাবু মারা গেছেন আপনি শোনেন নি বোধহয়।'

প্রভাত কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল, যেন কেষ্টবাবুর মরা-বাঁচা সম্বন্ধে তাহার তিলমাত্র কৌতূহল নাই।

'না, শুনিনি। কি হয়েছিল?'

'কাল রাত্রে কেউ তাকে ছুরি মেরেছিল।'

উদাসীনকণ্ঠে প্রভাত বলিল—'ও—'

ব্যোমকেশ বলিল—'যাক ও কথা। দয়ালহরিবাবুর নামে নিমাই নিতাই পাঁচ হাজার টাকার হ্যাণ্ড্‌নোটের উপর নালিশ করেছে জানেন নিশ্চয়।'

প্রভাতের মুখ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—'জানি। কিন্তু ও কথাও যেতে দিন ব্যোমকেশবাবু। মানুষের অ-মনুষ্যত্ব দেখে দেখে আমার মন বিষিয়ে গেছে। আমি আপনাকে জানাতে এসেছিলাম যে, আর আমার এখানে মন টিকছে না, আমি শিগগিরই চলে যাব।'

'সে কি কোথায় যাবেন?'

'তা এখনও ঠিক করিনি। পাটনায় ফিরে যেতে পারি। যেখানেই যাই দু' মুঠো জুটে যাবে। কলকাতায় আর নয়।'

'কিন্তু—আপনার দোকান?'

'দোকান বিক্রি করে দেব—'প্রভাতের মুখ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, সে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—'অজিতবাবু আপনার জানাশোনা কেউ আছে, যে বইয়ের দোকান কিনতে পারে? বেশী দাম আমি চাই না। তিন হাজার—আড়াই হাজার পেলেও আমি বিক্রি করে দেব।'

ভাবিতে লাগিলাম, জানাশোনার মধ্যে এমন কে আছে যে, বইয়ের দোকান কিনিতে পারে। হঠাৎ ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিল—'আমরা কিনতে পারি'। আমি আর অজিত কিছুদিন থেকে পরামর্শ করছি একটা বইয়ের দোকান খুলব। অজিত নিজে লেখক, ও চালাতে পারবে। আপনার দোকানটা যদি পাওয়া যায় তাহলে তো ভালই হয়।'

প্রভাতের মুখে একটু সজীবতা দেখা দিল, সে বলিল—'আপনারা নেবেন? তার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? আপনারা নিলে দোকান বিক্রি করেও আমার দুঃখ হবে না। তাহলে—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—'কত টাকার বই আছে আপনার দোকানে?'

প্রভাত বলিল—'হিসেব না দেখে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু চার হাজার টাকার কম হবে না।'

'বেশ, কাল সকালে গিয়ে আমরা আপনার হিসেব পত্র দেখব। দোকানের ওপর মর্টগেজ নেই তো?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে কথা রইল, কাল আমরা আপনার কাগজপত্র দেখব, স্টক মিলিয়ে নেব। যা ন্যায্য দাম তাই আপনি পাবেন। কিন্তু একটা কথা। ১৫ই আগষ্ট সকালে আমাদের দখল দিতে হবে। স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে ব্যবসা আরম্ভ করতে চাই।'

'তাই হবে। যখন দখল চাইবেন তখনই দেব। আজ উঠি, হিসেবের কাগজ পত্র ঠিক করে রাখতে হবে।'

'আচ্ছা। ভাল কথা, নৃপেনবাবু এখনও আছেন ?'

'আছেন। তাঁকে অবশ্য বলে দিয়েছি যে আমি দোকান রাখব না। তিনি অন্য চাকরি খুঁজছেন, পেলেই চলে যাবেন।—আপনারা কি তাঁকে রাখবেন ?'

'রাখতেও পারি। তাঁকে একবার এখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

'দোকানে গিয়েই পাঠিয়ে দেব।—আচ্ছা, নমস্কার।'

প্রভাত দ্বারের বাহিরে যাইবামাত্র ব্যোমকেশ এক লাফ দিয়া বিকাশকে ধরিল, দ্রুত হ্রস্ব কণ্ঠে তাহার কানে কানে কথা বলিয়া তাহার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজিয়া দিল। আমি কেবল তাহার শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইলাম—'মনে থাকে যেন, কাল রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এক মিনিট আপনার ছুটি নেই।'

বিকাশ একবার দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল, তারপর জ্যা-মুক্ত তীরের মত সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘর খালি হইয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কাণ্ডকারখানা কি ?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিল, ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—'একটা মস্ত সুযোগ হাতে এসেছে অজিত, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।'

'কোন সুযোগের কথা বলছ ?'

ব্যোমকেশ বলিল—'এই ধরো বইয়ের দোকানটা। যদি পাওয়া যায়, ছাড়া উচিত কি ? বইয়ের ব্যবসা খুব লাভের ব্যবসা ; তুমিও মনের মতন একটা কাজ পাবে। শুধু বই লিখে আজকাল কিছু হয় না। দেখছ তো, তোমাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান সহিত্যিক তাঁরা গুটি গুটি ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েছেন এবং বেশ দুধে-ভাতে আছেন।'

কথাটা সত্য। বইয়ের ব্যবসায় পয়সা আছে, বিশেষত যদি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের বাজার কোণ-ঠাসা করা যায়। তবু মৌখিক আপত্তি তুলিয়া বলিলাম—'কিন্তু এই দুঃসময়ে হঠাৎ এতগুলো টাকা বার করা কি ভাল?'

সে বলিল—'দু'জনে ভাগাভাগি করে দিলে গায়ে লাগবে না। তুমি হবে খাটিয়ে অংশীদার, আর আমি—ঘুমন্ত অংশীদার।'

আধঘণ্টা পরে নৃপেন আসিল। বলিল—'প্রভাতবাবু পাঠালেন। আপনি আমায় ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, বসুন ঐ চেয়ারে।' ব্যোমকেশ কঠিন চক্ষে কিয়ৎকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'আপনার সব কীর্তিই আমি জানতে পেরেছি। রমেশ মল্লিক আমার বন্ধু।'

ন্যাপা চমকিয়া কাষ্ঠমূর্তিতে পরিণত হইল। ব্যোমকেশ বলিল—'অনাদি হালদারের আলমারির চাবি আপনি তৈরী করেছিলেন। আলমারিতে অনেক টাকা ছিল, সে টাকা কোথায় গেল? আমি যদি পুলিসকে খবর দিই তারা জান্‌তে চাইবে। আপনি কী উত্তর দেবেন?'

ন্যাপা অধর লেহন করিল। ব্যোমকেশ বলিল—'আমি কথাটা পুলিসের কানে না তুলতে পারি, যদি আপনি আমার একটা কাজ করেন।'

ন্যাপার কণ্ঠ হইতে ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ বাহির হইল—'কি কাজ?'

'আর একটা চাবি তৈরী করে দিতে হবে।'

ষোলো

কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—পোহায় আগস্ট নিশি একত্রিশা বাসরে। তারপর কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, প্রথম পৌর স্বয়ংপ্রভুতার সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়া রাখে এমন কেহ বাঁচিয়া নাই। আবার আর একটি আগস্ট নিশি পোহাইল। এবারও পর্ব ঘরে ঘরে, এবারও বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া বেশ্যা করে সোর। কেবল পটভূমিকা আরও বিস্তৃত হইয়াছে, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া চিন্তা করিতে বসিলাম। এই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল ইহাতে আমার কৃতিত্ব কতটুকু? একটা পতাকা নাড়িয়াও তো সাহায্য করি নাই। (ব্যোমকেশ দিল্লীতে গিয়া সাত মাস ধরিয়া কিছু কাজ করিয়াছে)। আমার মত শত সহস্র মানুষ আছে যাহারা কিছুই করে নাই, অথচ তাহারা স্বাধীনতার ফল উপভোগ করিবে। একজন নৌকার দাঁড় টানে দশজন নদী পার হয়। ইহাই যদি সংসারের রীতি, তবে কর্ম ও কর্মফলের যোগাযোগ কোথায়?'

ব্যোমকেশকে আমার আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা বলিলাম। সে বলিল—'স্বাধীনতা পরের চেষ্টায় পেয়েছি, কিন্তু নিজের চেষ্টায় তাকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

বেলা সাড়ে ন'টার সময় ব্যোমকেশ বলিল—'চল, এবার বেরুনো যাক্। প্রভাতের বাসা হয়ে তার দোকানে যাব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'প্রভাতের বাসায় কী দরকার?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'ননাবালা দেবীকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

বৌবাজারের বাসার নিম্নতলে অনিবার্য্য ষষ্ঠীবাবু হুঁকা-হাতে বিরাজমান। আমাদের দেখিয়া চকিতভাবে হুঁকা হইতে মুখ সরাইলেন। ব্যোমকেশ মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'ওপরতলার সঙ্গে এখন আর কোনও গণ্ডগোল নেই তো?'

ষষ্ঠীবাবু উদ্বেগপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন—'না—হ্যাঁ—না, গণ্ডগোল আমার কোনও কালেই ছিল না—আমি বুড়ো মানুষ—কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই—'

ব্যোমকেশ হাসিল—আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

সিঁড়ির দরজা খুলিয়া দিল একটি দাসী। অপরিচিত দু'জন লোক দেখিয়া সে সরিয়া গেল, আমরা প্রবেশ করিলাম। যে ঘরটিতে পূর্বে একটি কেঠো বেঞ্চি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেই ঘরটিকে কয়েকটি আরামপ্রদ চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে. দেয়ালে রবিবর্মার ছবি। ননীবালা দেবী একটি বৃহৎ চেয়ারে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একটি প্রখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখিতেছেন; তাঁহার হাতে পেন্সিল।

ননীবালা দেবীর বেশভূষা দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায়। চক্‌চকে পাটের শাড়ির উপর লতা-পাতা কাটা ব্লাউজ, দুই বাহুতে মোটা মোটা তাগা ও চুড়ি; সোনার হইতে পারে, গিলি্‌টি হওয়াও অসম্ভব নয়। মুখে গৃহিণী-সুলভ গাম্ভীর্য। ননীবালা যে অনাদি হালদারের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজ মূর্তি ধারণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ননীবালা আমাদের দেখিয়া একটু থতমত হইলেন, তারপর হারমোনিয়ামের ঢাকনি খুলিয়া সম্ভাষণ করিলেন—'আসুন আসুন—। কেমন আছেন?— ওরে চিনিবাস, দু'পেয়ালা চা নিয়ে আয়। ব্যোমকেশবাবু, একটু মিষ্টিমুখ—?'

'না না, ও সব কিছু দরকার নেই। আমরা প্রভাতবাবুর খোঁজে এসেছিলাম।'

'প্রভাত! সে তো আটটার সময় দোকানে চলে গেছে।—একটু বসবেন না?'

চেয়ারে নিতম্ব ঠেকাইয়া বসিলাম। শুধু ঝি নয়, চিনিবাস নামধারী ভৃত্যও আছে, সম্ভবত রাঁধুনীও নিযুক্ত হইয়াছে। শুক্রের মহাদশা না পড়িলে হঠাৎ এতটা বাড়্-বাড়ন্ত দেখা যায় না।

ব্যোমকেশ বলিল—'ওটা কি করছেন?'

ননীবালা বলিলেন—'ক্রস্ওয়ার্ড পাজ্‌ল্ ভাঙছি। জানেন, আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি, একুশ হাজার টাকা।' তাঁহার কণ্ঠে হারমোনিয়মের সপ্তস্বর গিট্‌কিরি খেলিয়া গেল।

গয়নাগুলা তবে গিল্‌টির নয়। আমরাও কিছুদিন ক্রস্ওয়ার্ডের ধাঁধা ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের ভাঙা কপাল, ধাঁধা ভাঙিতে পারি নাই।

অভিনন্দন জানাইয়া ব্যোমকেশ বলিল—'আজ তাহ'লে উঠি। নৃপেনবাবুও কি দোকানে গেছেন?'

ননীবালা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন—'না। কাল থেকে ওর কি হয়েছে, ঘরে দোর বন্ধ করে আছে। কী যে করছে ওই জানে, খাওয়া দাওয়ার সময় নেই, দোকানে যাওয়া নেই—ওকে দিয়ে আর দেখছি আমাদের চলবে না।'

আমরা বিদায় লইলাম। পথে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল—'প্রভাত যে দোকান বিক্রি করে দিচ্ছে এ খবর বোধহয় ননীবালা জানেন না।'

দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর বলিল—'তুমি দোকানে যাও, আমি আসছি। জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে।'

দোকানের সামনা-সামনি রাস্তার অপর পারে গোলদিঘির দেয়াল ঘেঁষিয়া এক ছোকরা জুতা মেরামত করার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়াছিল, ব্যোমকেশ তাহার কাছে গিয়া জুতা মেরামত করাইতে লাগিল। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম।

প্রভাত হিসাবের খাতাপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, বলিল—'এই যে! ব্যোমকেশবাবু এলেন না?'

'আসছে। আপনার হিসেব তৈরি?'

'হ্যাঁ। এই দেখুন না।'

আমি হিসাব দেখিতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্যোমকেশ আসিয়া যোগ দিল। হিসাব পরীক্ষা শেষ করিতে বেলা দুপুর হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল—'আমরা তিন হাজার টাকাই দেব। কাল সকাল আটার সময় চেক্ পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দখল দিতে হবে।'

'যে আজ্ঞে।'—

সেদিন অপরাহ্ণে ব্যোমকেশ বলিল—'ইন্দুবাবুকে টেলিফোন কর না, গদানন্দর সাম্প্রতিক খবর যদি কিছু পাওয়া যায়।'

বলিলাম—'গদানন্দ তো পালিয়েছে, তাকে ইন্দুবাবু কোথায় পাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল—'গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু ফেরারী হয়নি। শিউলী সাবালিকা, সে যদি কারুর সঙ্গে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তাতে ফৌজদারী হয় না। গদানন্দ খুব সম্ভব তাকে নিজের বাসায় তুলেছে।'

'আচ্ছা দেখি—।'

ইন্দুবাবুকে ফোন করিলাম। তিনি আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—'গদানন্দর খবর জানি বৈকি। তাকে নিয়ে সিনেমা-মহল এখন সরগরম। সেদিন আপনাদের বলেছিলাম কিনা!

গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে ভেগেছে, তারপর তাকে রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করেছে। এই নিয়ে গদানন্দর তিনবার হ'ল।'

'তিনবার! তিনবার কী?'

'তিনবার বিয়ে।'

'বলেন কি, আরও তুটো বৌ আছে?'

'এখন আর নেই। প্রথম বৌটা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, কিন্তু সিনেমায় সুবিধে হ'ল না; ক্যামেরায় তার চেহারা ভাল এল না। সে হঠাৎ একদিন হার্ট ফেল ক'রে মারা গেল। তারপর গদানন্দ আর একটা মেয়েকে ফুস্‌লে এনে বিয়ে করল। এ মেয়েটা অভিনয় ভালই করত কিন্তু personality ছিল না, দেখা গেল তাকে দিয়ে হিরোইনের পার্ট চলবে না। সেটাও বেশীদিন টিক্‌ল না।'

'কি সর্বনাশ! আপনার কি মনে হয় গদানন্দ বৌ তু'টোকে—অ্যাঁ!'

'ভগবান জানেন। শিউলীর অবশ্য মাইকের গলা ভাল এই যা ভরসা।'—

ব্যোমকেশকে বার্তা শুনাইলাম। সে আপন মনে মৃত্যু মৃত্যু হাসিতে লাগিল, তারপর বলিল—'গদানন্দর বংশপরিচয় জান্‌তে ইচ্ছে করে। এক পুরুষে এতটা হয় না।'

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নগর দীপাবলীতে সজ্জিত হইয়া আর একটি দীপান্বিতা রাত্রিকে স্মরণ করাইয়া দিল। ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে রেডিওর জলদমন্দ্র স্বর অন্য সব শব্দকে ডুবাইয়া দিল। সকলেরই কান পড়িয়া আছে দিল্লীর পানে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইবে।

সাতটার সময় চকিতের ন্যায় নৃপেন আসিল, দ্বারের নিকট হইতে ব্যোমকেশের হাতে একটি চক্‌চকে চাবি দিয়া আলাদীনের জিনের মত অদৃশ্য হইল।

দশটার সময় আমরা আহার শেষ করিলাম।

সাড়ে এগারটার সময় ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে বলিল—'আমরা এখনি বেরুব, কখন ফিরব ঠিক নেই। তুই জেগে থাকিস। আর একটা আংটায় কাঠকয়লা দিয়ে আগুন করবার জোগাড় করে রাখিস। আমরা ফিরে এলে আগুন জ্বালবি।'

পুঁটিরাম 'যে-আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কাঠকয়লার আগুন কি হবে।'

সে বলিল—'অতীতকে ভস্মীভূত করে ফেলতে হবে।'

মধ্যরাত্রির কিছু আগে আমরা বাহির হইলাম। ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিতেছে—

গোলদীঘির চারি পাশের দোকানগুলি কিন্তু বন্ধ। দোকান-দারেরা বোধ করি নিজ নিজ ঘরে গিয়া রেডিও যন্ত্র আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন। এত রাত্রে এদিকের রাস্তাগুলিও জনবিরল হইয়া আসিয়াছে।

একটি ল্যাম্পপোস্টের ছায়াতলে একজন লোক দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল, আমরা নিকটবর্তী হইলে বাহির হইয়া আসিল। দেখিলাম বিকাশ।

ব্যোমকেশ বলিল—কিছু খবর আছে নাকি?'

বিকাশ বলিল 'না। প্রভাতবাবু সাড়ে ন'টার সময় দোকান বন্ধ করে চলে গেছেন।'

'হাতে কিছু ছিল?'

'না।'

'তারপর আর কেউ আসেনি?'

'না।'

'আচ্ছা, আসুন তাহলে।'

তিনজনে রাস্তা পার হইয়া প্রভাতের দোকানের সম্মুখে

উপস্থিত হইলাম। ব্যোমকেশ চাবি দিয়া দ্বারের তালা খুলিল; বেশ অনায়াসে তালা খুলিয়া গেল। তারপর চাবি বিকাশের হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'আমরা দুজনে ভেতরে যাচ্ছি, আপনি তালা বন্ধ করে দিন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলা যায় না। আপনি যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন। যদি কেউ দোর খুলে ভেতরে ঢোকে, আপনার কিছু করবার দরকার নেই।'

'আচ্ছা স্যার।'

আমরা অন্ধকার দোকানে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশের পকেটে বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, সে তাহা জ্বালিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। সারি সারি বইগুলা যেন দাঁত বাহির করিয়া নীরবে হাসিল। আমরা পিছনের কুঠ্রীতে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোশের কিনারায় বসিলাম, মাঝের দরজা একপাট খোলা রহিল। ব্যোমকেশ বলিল—'এ ঘরে বই নেই, এ ঘরে বোধ হয় আসবে না।'

আমি বলিলাম—'ব্যোমকেশ, রাতদুপুরে আমরা প্রভাতের দোকানে কি করছি জানতে পারি কি?'

ব্যোমকেশ আমার কানে কানে বলিল 'গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়িয়ে হামা, খাপ পেয়েছেন গোষ্ঠমামা।'

*　　　*　　　*

বইয়ের দোকানের একটা গন্ধ আছে—নূতন বইয়ের গন্ধ। এই গন্ধ সাধারণত টের পাওয়া যায় না, কিন্তু গভীর রাত্রে দোকানের মধ্যে বন্ধ থাকিলে ধীরে ধীরে অনুভব হয়। একটু ঝাঁঝালো, নাক সুড় সুড় করে, হাঁচি আসে।

তার উপর নিজেদের নিশ্বাসের কার্বন-ডায়ক্সাইড আছে। ঘণ্টাখানেক প্রতীক্ষা করিবার পর অনুভব করিলাম, ঘরের বাতাস

ভারি হইয়া আসিতেছে। গরমে প্রাণ আনচান করিয়া উঠিল। বলিলাম—'ব্যোমকেশ—'

ব্যোমকেশ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিল, তাহার গলা হইতে চাপা শীৎকার বাহির হইল—'স্ স্ স্—।'

আর একটি শব্দ কানে আসিল—কেহ চাবি দিয়া দ্বারের তালা খুলিতেছে।······দরজা একটু ফাঁক হইল, বাহিরের আলো অচ্ছাভ পর্দার মত ধীরে ধীরে প্রসারিত হইল। একটি ছায়ামূর্তি প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। আমরা রুদ্ধশ্বাসে কুঠুরীর ভিতর হইতে দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দোকানঘরের মাঝখানে দপ্ করিয়া টর্চের আলো জ্বলিয়া উঠিল। আলোর দৃষ্টি উর্ধ্বদিকে, সার্চ-লাইটের মত দেয়ালের উপর দিকে পড়িয়াছে। টর্চের পিছনে মানুষটিকে দেখা গেল না।

টর্চ হাতে লইয়া মানুষটি কাউন্টারের উপর লাফাইয়া উঠিল। আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া কুঠুরীর দ্বারের নিকট হইতে উঁকি মারিলাম। টর্চের আলো বইয়ের সর্বোচ্চ তাকের উপর পড়িয়াছে। মানুষটি হাত বাড়াইয়া একটি বই বাহির করিয়া লইল; আকারে আয়তনে অনেকটা 'চলন্তিকা'র মত। তারপর আর একটি বই বাহির করিল, তারপর আর একটি। এমনিভাবে পাঁচখানি বই লইয়া মানুষটি লাফাইয়া নীচে নামিল; কাউন্টারের উপর জ্বলন্ত টর্চ রাখিয়া একটি বাজার করা থলিতে বইগুলি ভরিতে লাগিল।

থলিতে বইগুলি ভরা হইয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ গিয়া মানুষটির কাঁধে হাত রাখিল, বলিল—'থলিটা আমায় দিন।'

মানুষটির গলায় করাতের মত দ্রুত নিশ্বাস টানার শব্দ হইল। তারপর ব্যোমকেশ তাহার মুখের উপর নিজের টর্চের আলো ফেলিল।

মুখখানা ভয়ে ও বিস্ময়ে বিকৃত হইলেও চেনা শক্ত নয়—প্রভাতের মুখ।

তাহার চোখের শাদা অংশই অধিক দেখা যাইতেছে। সে মিনিটখানেক চাহিয়া থাকিয়া অভিভূত স্বরে বলিল—'ব্যোমকেশ-বাবু।'

'হ্যাঁ, আমি আর অজিত। থলিটা দিন।'

প্রভাত একটু ইতস্তত করিল, তারপর থলি ব্যোমকেশের হাতে দিল।

ব্যোমকেশ থলিটা আমার হাতে দিয়া বলিল—'অজিত, এটা রাখ। বইগুলো ভারি দামী।—প্রভাতবাবু, এবার চলুন।'

প্রভাত আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'কোথায় যেতে হবে? থানায়?'

ব্যোমকেশ বলিল—'না, আপাতত আমার বাসায়। আগে বইগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

তিনজনে দোকানের বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশের ইঙ্গিতে প্রভাত দ্বারে তালা লাগাইল। ফিরিয়া দেখি বিকাশ অলক্ষিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল—বিকাশবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আপনার ছুটি। কাল সকালে একবার বাসায় আসবেন।'

'যে আজ্ঞে স্যার'—বিকাশ অন্তর্হিত হইল। আমি ও ব্যোমকেশ প্রভাতকে মাঝখানে লইয়া বাসার দিকে চলিলাম।

সতেরো

তিনজনে আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে উপবিষ্ট হইয়াছি। প্রভাত ও আমি দুইটি চেয়ারে বসিয়াছি, ব্যোমকেশ তক্তাপোশের উপর বইয়ের থলিটি লইয়া বসিয়াছে। রাত্রি প্রায় দুইটা ; বাহিরে নগর-গুঞ্জন শান্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ। সে চোখ তুলিয়া একবার প্রভাতের পানে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; প্রভাতের মুখে কিন্তু অপরাধের গ্লানি নাই, ধরা পড়িবার সময় যে চকিত ভয় ও বিস্ময় তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। সে এখন সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ, সকল-প্রকার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত।

ব্যোমকেশ একে একে বইগুলি থলি হইতে বাহির করিল। বোর্ডের বাঁধাই বাদামী রঙের বইগুলি, বাহির হইতে দৃষ্টি-আকর্ষক নয়। কিন্তু ব্যোমকেশ যখন তাহাদের পাতা মেলিয়া ধরিল, তখন উত্তেজনায় হঠাৎ দম আটকাইবার উপক্রম হইল। প্রত্যেক বইয়ের প্রত্যেকটি পাতা এক একটি একশত টাকার নোট।

ব্যোমকেশ বইগুলি একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া পাশে রাখিল, প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল—'সবসুদ্ধ কত আছে বইগুলোতে ?'

প্রভাত বলিল—'প্রায় দু'লাখ। কিছু আমি খরচ করেছি।'

'দয়ালহরি মজুমদারকে যে টাকা দিয়েছেন তা ছাড়া আর কিছু খরচ হয়েছে ?'

প্রভাতের চোখের দৃষ্টি চকিত হইল ; ব্যোমকেশ এত কথা কোথা হইতে জানিল এই প্রশ্নটাই যেন তাহার চক্ষু হইতে উঁকি

মারিল। কিন্তু সে কোনও প্রশ্ন না করিয়া বলিল,—'আরও কিছু খরচ হয়েছে, সব মিলিয়ে চৌদ্দ পনেরো হাজার।'

ব্যোমকেশ তখন বইগুলির উপর হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল—'প্রভাতবাবু এইগুলোর জন্যেই কি আপনি অনাদি হালদারকে খুন করেছিলেন?'

প্রভাত দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল—'না, ব্যোমকেশবাবু।'

'তবে কি জন্যে একাজ করলেন বলবেন কি?'

প্রভাত একবার যেন বলিবার জন্য মুখ খুলিল, তারপর কিছু না বলিয়া মুখ বন্ধ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল—'আপনি যদি না বলেন, আমিই বলছি।—শিউলীর সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে অনাদি হালদার নিজে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এইজন্যে—কেমন?'

প্রভাত কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার রগের শিরাগুলো উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দাঁতের গড়নে যে হিংস্রতা আগে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কথা বলিবার সময় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল; সে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল—'হ্যাঁ। অনাদি হালদার শিউলীর বাপকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে রাজি করিয়েছিল, এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিয়া গেল, নীরবে বসিয়া যেন অন্তরের আগুনে ফুলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল—'ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম তাহলে।—কিন্তু আপনি কেষ্টবাবুকে মারতে গেলেন কেন?'

ক্রোধ ভুলিয়া প্রভাত সবিস্ময়ে ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। বলিল—'সে কি! কেষ্টবাবুর কথা আমি তো কিছু জানি না!'

ব্যোমকেশ সন্দেহ-কণ্টকিত দৃষ্টিতে প্রভাতকে বিদ্ধ করিল—আপনি কেষ্ট দাসকে খুন করেন নি?'

প্রভাত বলিল—'না, ব্যোমকেশবাবু। কেষ্টবাবু গত আট মাসে আমার কাছ থেকে আট হাজার টাকা নিয়েছে। তার মরার খবর পেয়ে আমি খুশী হয়েছিলাম ; কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। বিশ্বাস করুন, আমি যদি খুন করতাম, আজ আপনার কাছে অস্বীকার করতাম না।'

ব্যোমকেশের মুখখানা ধীরে ধীরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, যে বিষণ্নতা কুয়াশার মত তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন কাটিয়া গেল। সে বলিল—'কিন্তু—কেষ্ট দাসকে তাহলে খুন করলে কে ?''

'তা জানি না। তবে—' প্রভাত ইতস্তত করিল।

'তবে—?'

প্রভাত একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল—'দশ-বারোদিন আগে বাঁটুল সর্দার আমার কাছে এসেছিল। বাঁটুলকে আপনারা বোধ হয় চেনেন না—'

'খুব চিনি। এমন কি আপনার সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ তাও জানি।—তারপর বলুন।'

'বাঁটুল আমাকে কেষ্টবাবুর কথা জিগ্যেস করতে লাগল ঃ কেষ্টবাবু কে, অনাদিবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কী জানে, এই সব। আমি বাঁটুলকে সব কথাই বললাম। তারপর—'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল—'যাক, এবার বুঝেছি। আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে কেষ্ট দাসের টাকার ক্ষিদে মেটেনি, সে গিয়েছিল বাঁটুলকে ব্ল্যাকমেল করতে। অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।' —ব্যোমকেশ হাঁক দিল—'পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম ভিতর দিকের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ বলিল—'পুঁটিরাম, তিন পেয়ালা চা হবে ?'

পুঁটিরাম বলিল—'আজ্ঞে, দুধ নেই বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল—'কুছ পরোয়া নেই, আদা দিয়ে চা তৈরি কর। আর কয়লার আংটা ঠিক করে রেখেছ ?'

'আজ্ঞে।'

'বেশ, এবার তাতে আগুন দিতে পার।'

পুঁটিরাম প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ বলিল—'প্রভাতবাবু, আপনার মা—ননীবালা দেবী—বোধ হয় কিছু জানেন না ?'

'আজ্ঞে না।' প্রভাত কিছুক্ষণ বিস্ময়-সম্ভ্রমভরা চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'আপনি কি সবই জানতে পেরেছেন ব্যোমকেশবাবু ?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'বোধ হয় পেরেছি। তবে বলা যায় না, কিছু ভুলচুক থাকতে পারে। যেমন কেষ্ট দাসের মৃত্যুটা আপনার ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল, ছুরি আপনার অস্ত্র নয়।'

আমি বলিলাম—'ব্যোমকেশ, কি করে সব বুঝলে বল না, আমি তো এখনও কিছু বুঝিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল—'বেশ বলছি। অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে, তা আমি পাটনা যাবার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম অনাদি হালদারের মৃত্যু সম্বন্ধে কারুরই যখন কোনও গরজ নেই, তখন আমারই বা কিসের মাথা ব্যথা। কিন্তু ফিরে এসে যখন দেখলাম কেষ্ট দাসও খুন হয়েছে, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। যে লোক মানুষ খুন করে নিজের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়, তাকে শাসন করা দরকার। যা হোক, এখন দেখছি আমি ভুল করেছিলাম, প্রভাতবাবু কেষ্ট দাসকে খুন করেন নি। আমি একটা কঠোর কর্তব্যের হাত থেকে মুক্তি পেলাম।—এবার গল্পটা শোনো। প্রভাতবাবু, যদি কোথাও ভুলচুক হয় আপনি বলে দেবেন।'

ব্যোমকেশ অনাদি হালদারের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিলাম, আজিকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নূতন। ব্যোমকেশ হত্যাকারীকে বন্ধুর মতন ঘরে বসাইয়া হত্যার কাহিনী শুনাইতেছে, এরূপ ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই।

—'অনাদি হালদার গত যুদ্ধের সময় কালাবাজারে অনেক টাকা রোজগার করেছিল। বোধ হয় আড়াই লাখ কি তিন লাখ। প্রভাতবাবু, আপনি ক'খানা বই বেঁধেছিলেন?'

প্রভাত বলিল—'ছ'খানা। প্রত্যেকটাতে চারশো নোট ছিল।'

'অর্থাৎ তু'লাখ চল্লিশ হাজার।—বেশ ধরা যাক অনাদি হালদার পৌনে তিন লাখ কালো টাকা রোজগার করেছিল। প্রশ্ন উঠল, এ টাকা সে রাখবে কোথায়? ব্যাঙ্কে রাখা চলবে না, তাহলে ইন্‌কম ট্যাক্সের ডালকুত্তারা এসে টুঁটি টিপে ধরবে। অনাদি হালদার এক মতলব বার করল।

'অনাদি হালদার যেমন পাজি ছিল, তেমনি ছিল তার কুচুটে বুদ্ধি। আজ পর্যন্ত ইন্‌কম ট্যাক্সের পেয়াদাকে ফাঁকি দেবার অনেক ফন্দি-ফিকির বেরিয়েছে, সব আমার জানা নেই। কিন্তু অনাদি হালদার যে ফন্দি বার করল, সেটাও মন্দ নয়। প্রথমে সে টাকাগুলো একশো টাকার নোটে পরিণত করল। সব এক জায়গায় করল না; কিছু কলকাতায়, কিছু দিল্লীতে, কিছু পাটনায়; যাতে কারুর মনে সন্দেহ না হয়।

'পাটনায় যাবার হয়তো অন্য কোনও উদ্দেশ্যও ছিল। যা হোক, সেখানে সে দপ্তরীর খোঁজ নিল; প্রভাতবাবু তার বাসায় এলেন বই বাঁধতে। বিদেশে বাঙালীর ছেলে, প্রভাতবাবুকে দেখে অনাদি হালদারের পছন্দ হল। এই ধরনের দপ্তরী সে খুঁজছিল, সে প্রভাতবাবুকে আসল কথা বলল; এও বলল যে, সে তাঁকে

পুষ্যিপুত্তুর নিতে চায়। পুষ্যিপুত্তুর নেবার কারণ, এত বড় গুপ্তকথা জানবার পর প্রভাতবাবু চোখের আড়াল না হয়ে যান।

'প্রভাতবাবু বই বেঁধে দিলেন। পুষ্যিপুত্তুর নেবার প্রস্তাব পাকাপাকি হল। অনাদি হালদার প্রভাতকে আর ননীবালা দেবীকে নিয়ে কলকাতায় এল। নোটের বইগুলো অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে আলমারিতে উঠল। ষ্টিলের আলমারি, তার একমাত্র চাবি থাকে অনাদি হালদারের কোমরে। সুতরাং কেউ যে আলমারি খুলবে, সে সম্ভাবনা নেই। যদি-বা কোনও উপায়ে কেউ আলমারি খোলে, সে কী দেখবে? কতকগুলো বই রয়েছে, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি। টাকাকড়ি সামান্যই আছে। বই খুলে বইয়ের পাতা পরীক্ষা করার কথা কারুর মনে আসবে না। এছাড়া বাইরের লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ব্যাঙ্কেও কয়েক হাজার টাকা রইল।

'অনাদি হালদারের কলকাতার বাসায় আরও দু'জন লোক ছিল—কেষ্ট দাস আর নৃপেন। নৃপেন ছিল তার সেক্রেটারী। অনাদি হালদার ভাল লেখাপড়া জানত না, তাই ব্যবসার কাজ চালাবার জন্যে নৃপেনকে রেখেছিল। আর কেষ্ট দাস জোর করে তার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। কেষ্ট দাস ছিল অনাদি হালদারের ছেলেবেলার বন্ধু, অনাদির অনেক কুকীর্তির খবর জানত, নিজেও তার অনেক কুকীর্তির সঙ্গী ছিল।

'অনাদি হালদার সতরো-আঠারো বছর বয়সে নিজের বাপকে এমন প্রহার করেছিল যে, পরদিনই বাপটা মরে গেল। পিতৃহত্যার বীজ ছিল অনাদির রক্তে। জীবজগতে বাপ আর ছেলের সম্পর্ক হচ্ছে আদিম শত্রুতার সম্পর্ক; সেই আদিম পাশবিকতার বীজ ছিল অনাদি হালদারের রক্তে। বাপকে খুন করে সে নিরুদ্দেশ হল। আত্মীয়স্বজনেরা অবশ্য কেলেঙ্কারীর ভয়ে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিলে।

অনেকদিন পরে অনাদির সঙ্গে কেষ্ট দাসের আবার দেখা ; দুজনে মিলে এক মাড়োয়ারীর ঘরে ডাকাতি করতে গেল। অনাদি মাড়োয়ারীকে খুন করে টাকাকড়ি নিয়ে ফেরারী হল, কেষ্ট দাস লুটের বখরা কিছুই পেল না।

'এবার কুড়ি বছর পরে অনাদির সঙ্গে আবার কেষ্ট দাসের দেখা। অনাদি তখন বৌবাজারের বাসা নিয়ে বসেছে ; কেষ্ট দাস তাকে বলল—তুমি খুন করেছ, যদি আমাকে ভরণপোষণ না কর, তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেব। নিরুপায় হয়ে অনাদি কেষ্ট দাসকে ভরণপোষণ করিতে লাগল।

'এদিকে অনাদি হালদারের দুই ভাইপো নিমাই আর নিতাই খবর পেয়েছিল যে, খুড়ো অনেক টাকার মালিক হয়ে কলকাতায় এসে বসেছে। তারা অনাদির কাছে যাতায়াত শুরু করল। অনাদি ভারি ধূর্ত, সে তাদের মতলব বুঝে কিছুদিন তাদের ল্যাজে খেলালো, তারপর একদিন তাড়িয়ে দিলে। নিমাই নিতাই দেখল, খুড়োর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়, তারা খুড়োর ভাবী পুষ্যিপুত্তুরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না। গুর্খা দরোয়ান দেখে তারা প্রভাতবাবুর দোকানে যাওয়া বন্ধ করল।

কিন্তু এত টাকার লোভ তারা ছাড়তে পারছিল না। কোনও দিকে কিছু না পেয়ে তারা অনাদি হালদারের বাসার সামনে হোটেলে ঘর ভাড়া করল, অষ্টপ্রহর বাড়ির ওপর নজর রাখতে লাগল। এতে অবশ্য কোনও লাভ ছিল না, কিন্তু মানুষ যখন কোনও দিকেই রাস্তা খুঁজে না পায়, তখন যা হোক একটা করেই মনকে ঠাণ্ডা রাখে। নিমাই-নিতাই পালা করে হোটেলে আসত, আর চোখে দূরবীন লাগিয়ে জানলায় বসে থাকত। অজিত, তোমার মনে আছে বোধ হয়, ননীবালা যেদিন প্রথম এসেছিলেন,

তিনি বলেছিলেন, সর্বদাই যেন অদৃশ্য চক্ষু তাঁদের লক্ষ্য করছে। সে অদৃশ্য চক্ষু নিমাই নিতাইয়ের।

'যা হোক, দিন কাটছে। অনাদি হালদার জমি কিনে বাড়ি ফেঁদেছে। প্রভাতবাবুকে সে পুষ্যিপুত্তুর নেবার আশ্বাস দিয়ে এনেছিল, প্রথমটা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করল। তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দিলে; অ্যাটর্নীর কাছে গিয়ে পুষ্যিপুত্তুর নেবার বিধি-বিধান জেনে এল। কিন্তু বাঁধা-বাঁধির মধ্যে পড়বার খুব বেশী আগ্রহ তার ছিল না, সে পাকাপাকি লেখাপড়া করতে দেরি করতে লাগল। প্রভাতবাবু দোকান নিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন, ননীবালা দেবী জানেন না যে পুষ্যিপুত্তুর নিতে হলে লেখাপড়ার দরকার। তাই এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করল না।

'তারপর এক ব্যাপার ঘটল। প্রভাতবাবু শিউলী মজুমদারকে দেখে এবং তার গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি শিউলীদের বাড়িতে যাতায়াত স্বরু করলেন। দয়ালহরি মজুমদার ঘুঘু লোক, সে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল যে প্রভাতবাবু বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর; প্রভাতবাবুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তার আপত্তি হল না। দয়াল-হরি মজুমদারের চালচুলো নেই, সে ভাবল ফাঁকতালে যদি মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়, মন্দ কি!

'প্রভাতবাবু ননীবালা দেবীকে শিউলীর কথা বললেন। ননীবালা অনাদি হালদারকে বললেন। প্রভাতবাবুর বিয়ে দিতে অনাদি হালদারের আপত্তি ছিল না, সে বলল—মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয় তো বিয়ে দেব।

'তখন পর্যন্ত অনাদি হালদারের মনে কোনও বদ্-মতলব ছিল না, নেহাৎ বরকর্তা সেজেই সে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু শিউলীকে দেখে সে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। মানুষের চরিত্রে

যতরকম দোষ থাকতে পারে, কোনটাই অনাদি হালদারের বাদ ছিল না। সে ঠিক করল, শিউলীকে নিজে বিয়ে করবে।

'বাসায় ফিরে এসে সে বলল—মেয়ে পছন্দ হয়নি। তারপর তলে তলে নিজের ঘটকালি আরম্ভ করল। দয়ালহরি মজুমদার দেখল, দাঁও মারবার এই সুযোগ; সে ঝোপ বুঝে কোপ মারল। অনাদি হালদারকে বলল—তুমি বুড়ো, তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব কেন? তবে যদি তুমি দশ হাজার টাকা দাও—

'এইভাবে কিছুদিন দর-কষাকষি চলল, তারপর রফা হল—অনাদি হালদার পাঁচ হাজার টাকা হ্যাণ্ডনোটের ওপর ধার দেবে। বিয়ের পর হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলা হবে।

'বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে নিয়ে অনাদি হালদার ভাবতে বসল, কি করে প্রভাতবাবুকে তাড়ানো যায়। পুষ্যিপুত্তুর নেবার আগ্রহ কোনওকালেই তার বেশী ছিল না, এখন তো তার পক্ষে প্রভাত-বাবুকে বাড়িতে রাখাই অসম্ভব। প্রভাতবাবুর প্রতি তার ব্যবহার রূঢ় হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ সে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেও পারল না। প্রভাতবাবু বইবাঁধানো নোটের কথা যদি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, অনাদি হালদারকে ইন্‌কম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে জেলে যেতে হবে।

'প্রভাতবাবু ভিতরের কথা কিছুই জানতেন না। সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়াতে তিনি খুবই মুষ্‌ড়ে পড়লেন, তারপর ঠিক করলেন অনাদি-বাবুর অমতেই শিউলীকে বিয়ে করবেন, যা হবার হবে। তিনি দয়ালহরির বাসায় গেলেন। দয়ালহরি তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে এবং জানিয়ে দিলে যে, অনাদি হালদারের সঙ্গে শিউলীর বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

এই পর্যন্ত বলিয়া ব্যোমকেশ থামিল। টিন হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে বলিল—'এই হচ্ছে অনাদি হালদারের মৃত্যুর

পটভূমিকা। এর মধ্যে খানিকটা অনুমান আছে—কিন্তু ভুল বোধ হয় নেই। প্রভাতবাবু, কি বলেন?'

প্রভাত বলিল—'ভুল নেই। অন্তত যতটুকু আমার জ্ঞানের মধ্যে, তাতে ভুল নেই।'

পুঁটিরাম চা লইয়া প্রবেশ করিল।

আঠার

তিনজনে নীরবে বসিয়া আদা-গন্ধী চা সেবন করিলাম। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল—'ননীবালা দেবী যখন প্রথম আমার কাছে এলেন তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমি উল্টো দিক থেকে দেখলাম। প্রভাতবাবুর জীবনের কোনও আশঙ্কা আছে কিনা এইটেই হল প্রশ্ন। ননীবালা যা বললেন তা থেকে ভয়ের কারণ আমি কিছু দেখতে পেলাম না। তবু বলা যায় না। দিনকাল খারাপ, নরহত্যা সম্বন্ধে মানুষের মন থেকে অনেক দ্বিধাসঙ্কোচ সরে গেছে; একটা আদিম বর্বরতার মনোভাব আমাদের চেপে ধরেছে। আমি তদারক করতে বেরুলাম।

'প্রভাতবাবুকে দেখলাম; নিমাই নিতাই, অনাদি হালদার, নৃপেন, কেষ্টদাস, সকলকেই দেখলাম। ননীবালা আবার এলেন, তাঁকে বললাম—প্রভাতবাবুকে মেরে কারুর কোনও লাভ নেই, বরং অনাদি হালদারকে মেরে লাভ আছে। তারপর কালীপূজোর রাত্রে সত্যিই অনাদি হালদার খুন হল।

'শেষ রাত্রে কেষ্টদাস এসে আমাকে নিয়ে গেল। সকলের বিশ্বাস কেষ্টদাসই খুন করেছে। আমি গিয়ে সব দেখেশুনে বুঝলাম, এ রাগের মাথায় খুন নয়, প্ল্যান করে খুন। কেষ্টদাস যদি খুন করত তাহলে খুন করবার আগেই অনাদি হালদারের সঙ্গে ঝগড়া করত না। তাছাড়া, যত ঝগড়াই হোক, যে-হংস স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করে তাকে খুন করবে এমন আহাম্মক কেষ্টদাস নয়।

'তবে একটা কথা আছে। কেষ্টদাস যদি অনাদি হালদারকে খুন করে একসঙ্গে মোটা টাকা হাতাতে পারে তাহলে সে খুন করবে। কিন্তু এ যুক্তি বাড়ির অন্য লোকগুলির সম্বন্ধেও খাটে। এ যুক্তি মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে অনাদি হালদারের বাড়িতে অনেক নগদ টাকা ছিল।

'অনাদি হালদার বাড়িতে মোটা টাকা রাখলে স্টীলের আলমারিতেই রাখত। আলমারির চাবি সর্বদা তার কোমরে থাকত। আমি যখন আলমারি খুললাম তখন তাতে মাত্র শ' দেড়েক টাকা পাওয়া গেল। তবে কি এই সামান্য টাকা রাখবার জন্যে অনাদি স্টীলের আলমারি কিনেছিল?

'আলমারিতে টাকা পাওয়া গেল না বটে কিন্তু দেখা গেল বইয়ের থাক্ থেকে কয়েকটা বই অদৃশ্য হয়েছে। বাকি বইগুলো রামায়ণ মহাভারত জাতীয়। প্রশ্ন: স্টীলের আলমারিতে এই জাতীয় নিতান্ত সাধারণ বই রাখার মানে কি?

'আলমারিতে ব্যাঙ্কের চেক-বই ছিল, তা থেকে জানা গেল যে ব্যাঙ্ক থেকে যে-পরিমাণ টাকা বার করা হয়েছে তার চেয়ে বেশী টাকা অনাদি হালদার তার নতুন বাড়ির কন্ট্রাক্টর গুরুদত্ত সিংকে দিয়েছে। বাকি টাকা এল কোথা থেকে? অনাদি হালদার নিশ্চয় কালো টাকা রোজগার করেছিল এবং তা আলমারিতে রেখেছিল। বর্তমানে টাকা যখন আলমারিতে নেই তখন হত্যাকারীই তা সরিয়েছে।

'হত্যার মোটিভ্ পাওয়া গেল। কিন্তু হত্যাকারী লোকটা কে? এবং কেমন করে সে বাড়িতে ঢুকল? মৃত্যুর সময় অনাদি হালদার বাড়িতে একলা ছিল এবং বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

'অনাদি হালদার গুলি খেয়েছিল সদরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে।

শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা থেকে তাকে সহজেই গুলি করে মারা যায় কিন্তু তার আলমারি থেকে টাকা সরানো যায় না। সুতরাং শ্রীকান্ত হোটেল থেকে মেরে কোনও লাভ নেই।

'নিমাই নিতাই যখন উকিল নিয়ে হাজির হল এবং দাবী করল যে তারাই অনাদি হালদারের ওয়ারিশ, প্রভাতবাবু আইনত পুষ্যি-পুত্তুর নয়, তখন আর একটা মোটিভ পাওয়া গেল। অনাদি হালদার পাকাপাকি পুষ্যি নেবার আগে যদি তাকে সরানো যায় তাহলে সব সম্পত্তি ভাইপোদের অর্শাবে। অনাদি হালদার নিশ্চয় উইল করেনি। এ দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত লোকেরা উইল করে না।

'নিমাই নিতাইয়ের পক্ষে খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। এখন দেখা যাক তাদের কার্যকলাপ। হত্যার ছ'মাস আগে তারা শ্রীকান্ত হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়েছিল এবং নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করত। হোটেলের চাকরদের সঙ্গে তাদেব মুখ চেনাচেনি হয়েছিল। যারা খুড়োকে খুন করতে উদ্যত হয়েছে তাদের পক্ষে এতটা খোলাখুলিভাব কি স্বাভাবিক? আগেই বলেছি, এ প্ল্যান করে খুন; খুনী ঠিক করেছিল কালীপুজোর রাত্রে খুন করবে, বাজি পোড়ানোর শব্দে যাতে বন্দুকের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। তাই যদি হয় তবে ছ'মাস আগে থেকে ঘর ভাড়া নেবার অর্থ কি? তাছাড়া কালীপূজোর রাত্রে খুড়ো যে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াবে তার নিশ্চয়তা কি? এ রকম অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করে কেউ প্ল্যান করে না। আবার গুলিটা অনাদি হালদারের শরীর ভেদ করে গিয়েছিল, অথচ সেটা ব্যাল্‌কনিতে পাওয়া গেল না। এও ভাববার কথা।

'সুতরাং শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা থেকে নিমাই নিতাই খুড়োকে মেরেছিল এ প্রস্তাব টেঁকসই নয়। যেই মারুক বাড়ির

ভেতর থেকে মেরেছে। দেখা যাক বাড়ির ভেতর থেকে মারা সম্ভব কিনা।

'সদর দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু বাড়ির পিছন দিকে ছাদে যাবার দরজাটা খোলা থাকত, অনাদি হালদার রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের হাতে সেটা বন্ধ করত। তাছাড়া দরজার ছিট্‌কিনি খুব শক্ত ছিল না, দু'চারবার দরজায় নাড়া দিলে ছিট্‌কিনি খুলে পড়ত। মনে করা যাক, সেদিন রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় একজন চুপিচুপি এসে অনাদি হালদারের নতুন বাড়িতে ঢুকল। নতুন বাড়ির একতলার ছাদ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, চারিদিকে ভারা বাঁধা। হত্যাকারী ছাতে উঠল; দুই বাড়ির মাঝখানে সরু গলি আছে, হত্যাকারী ভারা থেকে একটা লম্বা তক্তা নিয়ে দুই বাড়ির মাঝখানে পুল বাঁধল, তারপর সেই পুল দিয়ে পুরোনো বাড়িতে পেরিয়ে এল। ছাদের দরজা খোলা থাকবার কথা, কারণ অনাদি হালদার তখনও শুতে যায় নি।

'দেখা যাচ্ছে, একজন চট্‌পটে লোকের পক্ষে বাড়িতে ঢোকা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কে সেই চট্‌পটে লোকটি? নিমাই নিতাই নয়, কারণ আলমারিতে অনেক কালো টাকা আছে একথা তাদের জানবার কথা নয়; একথা কেবল বাড়ির লোকই জানতে পারে কিম্বা আন্দাজ করতে পারে।

'বাড়িতে চার জন লোক আছে—ননীবালা, কেষ্টদাস, নৃপেন আর প্রভাতবাবু। এদের মধ্যেই কেউ অনাদি হালদারকে খুন করেছে। যদি বল, নিমাই নিতাই বাড়িতে ঢুকে খুন করেছে এবং আলমারির থেকে মাল নিয়ে সট্‌কেছে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—তারা সাত-সকালে এসে বাড়ি দখল করতে চেয়েছিল কেন? চুপ করে বসে থাকাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যথাসময়ে আদালতের মারফত দখল তারা পেতই। তারা খুন করেনি বলেই তাড়াতাড়ি

এসে বাসার দখল নিতে চেয়েছিল, যাতে আলমারির জিনিসপত্র এরা সরিয়ে ফেলতে না পারে।

'যাহোক, রইল বাড়ির চার জন। এরা সকলেই অবশ্য বাইরে ছিল, কিন্তু কারুর পাকা অ্যালিবাই নেই। ননীবালা দেবীকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ তিনি মোটা মানুষ, তাঁকে চট্‌পটেও বলা চলে না। তক্তার ওপর দিয়ে গলি পার হওয়া তাঁর সাধ্য নয়।

'বাকি রইল কেষ্টদাস প্রভাতবাবু আর নৃপেন। গোড়ার দিকে নৃপেনের ওপরেই সবচেয়ে বেশী সন্দেহ হয়, চালচলন খুবই সন্দেহজনক। আলমারিতে যে অনেক টাকা আছে এটা তার পক্ষে জানা সবচেয়ে বেশী সম্ভব, কারণ সে অনাদি হালদারের সেক্রেটারী, টাকাকড়ির হিসেব রাখে। কিন্তু যখন জানতে পারলাম সে আলমারির চাবি তৈরি করেছিল তখন তাকেও বাদ দিতে হল। অনাদি হালদারকে খুন করবার মতলব যদি তার থাকত তবে সে চাবি তৈরি করতে যাবে কেন? অনাদি হালদারের কোমরেই তো চাবি রয়েছে।

'ভেবে দেখ। নৃপেনের স্বভাবটা ছিঁচ্‌কে চোরের মত। সে চাবি তৈরি করেছিল, মতলব ছিল অনাদি হালদার যখন বাড়ি থাকবে না তখন আলমারি খুলে দু'চার টাকা সরাবে। কিন্তু সরাবার সুযোগ বোধহয় তার হয়নি। চাবিটা তার টেবিলের দেরাজে রেখেছিল। সে-রাত্রে সিনেমা থেকে ফিরে এসে যখন দেখল অনাদি হালদার খুন হয়েছে তখন সে চাবির কথা সাফ্‌ ভুলে গেল। তারপর আমি অনাদি হালদারের কোমর থেকে চাবি নিয়ে সবাইকে দেখালাম, তখন নৃপেনের মনে পড়ে গেল। সর্বনাশ! পুলিস এসে যদি তার দেরাজে চাবি পায় তাহলে তাকেই খুনী বলে ধরবে। সে কোনও মতে চাবিটাকে বিদেয় করবার চেষ্টা করতে লাগল এবং

শেষ পর্যন্ত এক ফাঁকে চাবিটা জানলা দিয়ে গলিতে ফেলে দিলে।

'চাবিটা আমি সকালবেলা গলিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম নৃপেন খুন করেনি। তারপর আমার বন্ধু রমেশ মল্লিকের চিঠি পেয়ে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নৃপেন ছিঁচ্‌কে চোর, মানুষ খুন করবার সাহস তার নেই।

'বাকি রইল কেষ্টদাস আর প্রভাতবাবু।

'সেদিন সন্ধ্যেবেলা কেষ্টদাস এখানে এল। রাত্রে তাকে মদ খাইয়ে অনাদি হালদারের পুরোনো ইতিহাস জেনে নিলাম। কেষ্ট-দাসও সেদিন আমার কাছে একটা কথা জানতে পেরেছিল। আমি তাকে কথায় কথায় বলেছিলাম যে প্রভাতবাবু দপ্তরীর কাজ জানেন। কথাটা সে আগে জানত না।

'যা হোক, তারপর কয়েকদিন কেটে গেল। দেখলাম নৃপেন আর কেষ্টদাস পুরোনো বাসাতেই রয়েছে। তারা যদি টাকা মেরে থাকে তাহলে পুরোনো বাসা কামড়ে পড়ে আছে কেন? তাদের চলে যাবার যথেষ্ট ওজুহাত রয়েছে, অনাদি হালদার মরে যাবার পর ওদের ওবাড়িতে থাকার আর কোনও ছুতো নেই। টাকা-গুলোই বা রাখল কোথায়? ব্যাঙ্কে নিশ্চয় রাখবে না, অন্য কোনও লোকের হাতেও দেবে না। তবে?

'কলকাতায় ওদের অন্য কোনও আস্তানা নেই, যেখানে টাকা লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু প্রভাতবাবুর একটা আস্তানা আছে—দোকান। তিনি যদি খুন করে টাকা সরিয়ে থাকেন তাহলে টাকা লুকিয়ে রাখার কোনও অসুবিধা নেই।

'দোকান—বইয়ের দোকান। বিদ্যুৎ চমকের মত সমস্ত ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠল—প্রভাতবাবু পাটনায় হিসেবের খাতা বাঁধেন নি, বেঁধেছিলেন একশো টাকার

নোট—অনাদি হালদার তাঁর বাঁধানো বইগুলোকে রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে মিশিয়ে আলমারিতে রেখেছিল—প্রভাতবাবু অনাদি হালদারকে মারবার পর তার কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি থেকে নোটের বইগুলো বার করে নিজের দোকানে এনেছিলেন—দোকানের হাজারখানা বইয়ের মধ্যে নোটের বইগুলো প্রকাশ্যে সাজানো আছে—বাইরে থেকে বই দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না—

'আগাগোড়া প্ল্যানটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'কিন্তু—

'প্রভাতবাবু টাকার লোভে এমন কাজ করবেন? প্রভাতবাবুর চরিত্র যতখানি বুঝেছিলাম তাতে তাঁকে অর্থলোভী বলে মনে হয়নি। উপরন্তু অনাদি হালদারের মৃত্যুতে প্রভাতবাবুর ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী; সে বেঁচে থাকলে তাঁকে পুষ্যিপুত্তুর নেবে, সমস্ত সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা। নগদ টাকার লোভে সেই সম্ভাবনা তিনি নষ্ট করবেন?

'তবে কি টাকাটা গৌণ, তার চেয়ে বড় কারণ কিছু ছিল? অনাদি হালদার শিউলীর সঙ্গে প্রভাতবাবুর বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল; কিন্তু সেটা কি এতবড় অপরাধ যে তাকে খুন করতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেরিতে পেয়েছিলাম। দয়ালহরি মজুমদারের বাসা থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ আসল কথাটা মাথায় খেলে গিয়েছিল।

'অনাদি হালদার এমন কাজ করেছিল যাতে নিতান্ত নিরীহ লোকেরও মাথায় খুন চেপে যায়। সে দয়ালহরিকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে নিজে শিউলীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। প্রভাতবাবুর রক্তে আগুন ধরে গেল। আগুন ধরা বিচিত্র নয়, আগুনের ফুলকি তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল।

'আবার একটা বরফের মত ঠাণ্ডা কুট বুদ্ধি তাঁর ছিল, সেটাও

তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তিনি অনাদি হালদারকে ধনেপ্রাণে মারবার প্ল্যান ঠিক করলেন। বাঁটুল সর্দারকে তিনি আগে থাকতেই চিনতেন, রাইফেল ভাড়া করা কঠিন হল না। কালীপূজোর রাত্রে বুড়ো পাঁঠাকে বলি দেবার ব্যবস্থা হল।

'সে-রাত্রে প্রভাতবাবু ননীবালা দেবীকে সিনেমায় পৌছে দিয়ে দোকানে গেলেন। দোকান আলো দিয়ে সাজিয়ে সাড়ে দশটার সময় আবার বেরুলেন, এবার একটা কাপড়ের থলি পকেটে নিলেন। দোকান খোলাই রইল, গুর্খা দারোয়ান দরজায় পাহারায় রইল।

বাসার কাছে এসে প্রভাতবাবু দেখলেন বাসার সামনে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করল না, তিনি নতুন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। নতুন বাড়ির মধ্যে বাঁটুল সর্দার রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাঁটুল অনাদি হালদারের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সুতরাং তার এ ব্যাপারে উৎসাহ থাকাই স্বাভাবিক।

'ছাতের ওপর তক্তা ফেলে প্রভাতবাবু বাসায় ঢুকলেন। ছাতের দরজা সম্ভবত খোলাই ছিল; না থাকলেও ক্ষতি নেই, তিনি দু'চারবার দরজায় নাড়া দিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেললেন। ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়িয়ে অনাদি হালদার বাজি পোড়ানো দেখছিল, পিছন দিকে শব্দ শুনে সে ফিরে দাঁড়ালো। প্রভাতবাবু সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলেন। গুলিটা অনাদি হালদারের শরীর ভেদ করে রাস্তার ওপারে শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা দিয়ে ঢুকে দেয়ালে আট্‌কালো। হাই ভেলসিটি মিলিটারি রাইফেল, তার গুলি যদি নিমাই কিম্বা নিতাইকে সামনে পেতো তাকেও ফুটো করে যেত।

'তারপর প্রভাতবাবু মৃতের কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন। নোটের বইগুলো থলিতে পুরে, চাবি আবার যথাস্থানে রেখে যে পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে গেলেন। বাঁটুল অপেক্ষা করছিল, রাইফেল নিয়ে অদৃশ্য হল। প্রভাতবাবু দোকানে ফিরে

গিয়ে বইগুলো উঁচু একটা থাকে সাজিয়ে রেখে দিলেন। তারপর যথাসময়ে সিনেমায় গিয়ে মা'কে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরলেন।

'গুর্খা দারোয়ানটা জানত যে প্রভাতবাবু সে-রাত্রে সারাক্ষণ দোকানে ছিলেন না। আমি যখন গুর্খার খোঁজ নিলাম তখন সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে।

'সেদিন আমি আর অজিত প্রভাতবাবুর দোকানে যাচ্ছিলাম, দেখলাম বাঁটুল আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। সে প্রভাতবাবুর দোকানে ঢুকতে গিয়ে পিছনে আমাদের দেখে দোকানে ঢুকল না, সোজা চলে গেল। আমরা দোকানে গিয়ে দেখলাম প্রভাতবাবুর জ্বর হয়েছে, তাড়সের জ্বর। তাঁকে নিয়ে আমার জানা এক ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার প্রভাতবাবুকে পরীক্ষা করলেন এবং পরীক্ষার ফল আমাকে আড়ালে জানালেন। তখন আর সন্দেহ রইল না।

'প্রভাতবাবু যে অনাদি হালদারকে খুন করেছেন একথা আমার আগে আর একজন বুঝতে পেরেছিল—সে কেষ্টদাস। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, কেষ্টদাস জানত যে অনাদি হালদারের আলমারিতে কালো টাকা আছে; তাই সে যখন আমার মুখে শুনল যে প্রভাতবাবু দপ্তরীর কাজ জানেন তখন চট্ করে সমস্ত ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলে। সে প্রভাতবাবুকে শোষণ করতে আরম্ভ করল। অজিত, তোমার মনে আছে কি, একদিন ক্রমাগত একশো টাকার নোট দেখে দেখে আমাদের চোখ ঠিকরে গিয়েছিল? এমন কি রাত্রে হোটেলে খেতে গিয়েও নিস্তার ছিল না, সেখানে কেষ্টদাস একশো টাকার নোট বার করল। সেই নোটগুলির বেশীর ভাগই এসেছিল অনাদি হালদারের বাঁধানো নোটের বই থেকে।

'যাহোক, পাটনা যাবার আগে অনাদি হালদার ঘটিত ব্যাপার মন থেকে একরকম মুছে ফেলেই চলে গেলাম। কেবল বিকাশ

দত্তকে বলে গেলাম দয়ালহরি মজুমদার সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে।

'তারপর পাটনা থেকে ফিরে এসে দেখি—এক নতুন পরিস্থিতি। কেষ্টদাস খুন হয়েছে। কেষ্টদাস প্রভাতবাবুকে দোহন করছিল, তাই বিশ্বাস হল তিনিই তাকে খুন করেছেন। তখন আবার আসামীকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু শুধু অপরাধীকে ধরলেই চলবে না, টাকাগুলোও উদ্ধার করা চাই।

'টাকাগুলো সহজে উদ্ধার করবার জন্যে একটু চাতুরীর আশ্রয় নিতে হল, নৈলে সারা দোকান হাতড়ে নোটের বইগুলো বার করা কষ্টকর হত। হয়তো প্রভাতবাবু তল্লাসী করতে দিতেন না, পুলিস ডাকতে হত; আমার হাত থেকে সব বেরিয়ে যেত। তাই প্রভাতবাবু যখন দোকান বিক্রি করার কথা বললেন তখন ভারি সুবিধে হয়ে গেল। আমি বললাম, আমরা দোকান কিনব। সঙ্গে সঙ্গে বিকাশকে পাঠালাম নজর রাখবার জন্যে, প্রভাতবাবু দোকান থেকে কোনও জিনিস সরান কিনা।

'দোকান কেনার ব্যবস্থা পাকা হল, স্বাধীনতা দিবসের সকালে দখল দিতে হবে। জানতাম দখল দেবার আগে কোনও সময় বইগুলো প্রভাতবাবু সরাবেন। বিকাশ খবর দিলে, দিনের বেলা তিনি কিছু সরান নি। রাত্রে আমরা দোকানে ঢুকে প্রতীক্ষা করে রইলাম। ন্যাপা চাবি তৈরি করে দিয়েছিল—'

হঠাৎ বাহির হইতে বিপুল শব্দ তরঙ্গ আমাদের কর্ণপটাহে আঘাত করিল—রেডিও যন্ত্রের ঘুম ভাঙার আওয়াজ। আমরা চমকিয়া জানালার দিকে তাকাইলাম। বাহিরে দিনের আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৯

ব্যোমকেশ নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

'পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম দরজা দিয়া মুণ্ড বাড়াইল।

'আগুনের আংটা নিয়ে এস।'

আমি বলিলাম—'অনেকক্ষণ ধরে আংটার কথা শুনছি, কিন্তু আংটা কি হবে এখনও জানতে পারিনি।—হোম টোম করবে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল—'হ্যাঁ, হোম করব। এই নোটগুলো আগুনে আহুতি দেব।'

'মানে!'

'মানে নোটগুলো পুড়িয়ে ফেলব।'

আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম—'অ্যাঁ! দু' লাখ টাকা পুড়িয়ে ফেলবে!'

'হ্যাঁ। এই নোটগুলো কালো টাকা, অভিশপ্ত টাকা; এর ন্যায্য মালিক কেউ নেই। আজকের পুণ্য দিনে দেশমাতৃকার চরণে এই হবে আমাদের অঞ্জলি।'

'কিন্তু—কিন্তু—পুড়িয়ে ফেললে দেশমাতৃকা পাবেন কি? তার চেয়ে যদি ওই টাকা আমাদের নতুন গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া যায়—'

'একই কথা অজিত। পুড়িয়ে ফেললেও রাষ্ট্রকেই দেওয়া হবে। ভেবে দেখ, নোটগুলো তো সত্যিকারের টাকা নয়, গভর্ণমেণ্টের হ্যাণ্ডনোট মাত্র। হ্যাণ্ডনোট পুড়িয়ে ফেললে গভর্ণমেণ্টকে আর টাকা শোধ দিতে হবে না, দু' লাখ টাকা তার লাভ হবে। কিন্তু

এখন যদি নোটগুলো ফেরৎ দিতে যাও, অনেক হাঙ্গামা বাধবে। গভর্ণমেণ্ট জানতে চাইবে কোথা থেকে টাকা এল, তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। তার দরকার কি! এই ভাল, আগুনে যা আহুতি দেব তা দেবতার কাছে পৌঁছবে।—প্রভাতবাবু, আপনি কি বলেন?'

প্রভাত বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিয়া বসিয়া ছিল, কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'আমার কিছু বলবার নেই, আপনি। যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

পুঁটিরাম গন্‌গনে আগুনের আংটা আনিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে রাখিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল—'তুই এবার ঘুমোগে যা।'

পুঁটিরাম চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ্ আমাদের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। তারপর বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া আগুনে ফেলিতে লাগিল। মন্ত্রস্বরে বলিল—'স্বাহা—স্বাহা—স্বাহা—'

আমি আর বসিয়া দেখিতে পারিলাম না, উঠিয়া গিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, তাহাকে আমি ভালবাসি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু আজ তাহাব চরিত্রের একটা নূতন দিক দেখিতে পাইলাম। সে যাহা করিল আমি তাহা পারিতাম না, নিজের হাতে দুই লক্ষ টাকা পুড়াইয়া ফেলিতে পারিতাম না।

'স্বাহা—স্বাহা—'

ঘণ্টাখানেক পরে ব্যোমকেশ ও প্রভাত আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য উঠিয়াছে, চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম আংটার চারিপাশে কাগজ-পোড়া ছাই স্তূপীভূত হইয়াছে। কালো টাকার কালো ছাই।

তিনজনে জানালার ধারে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রভাত প্রথমে কথা কহিল, কম্পিত স্বরে বলিল—'ব্যোমকেশবাবু, আমি—

আমার সম্বন্ধে—আপনি যদি আমাকে খুনের অপরাধে ধরিয়ে দেন আমি অস্বীকার করব না।'

ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিল, অনুকম্পা দ্রবিত স্বরে বলিল—'আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব না। সব সভ্য দেশেই প্রথা আছে পর্ব-দিনে বন্দীরা মুক্তি পায়, আপনিও মুক্তি পেলেন। আপনার দোকান আমরা কিনব বলেছিলাম, যদি আপনি বিক্রি করে চলে যেতে চান আমরা দোকান নেব। কিম্বা যদি আমাদের কাছে দোকানের অর্ধাংশ বিক্রি করে অংশীদার করে নিতে চান তাতেও আপত্তি নেই।'

প্রভাত ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শেষে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—'ব্যোমকেশবাবু, এ আমার কল্পনার অতীত।'

ব্যোমকেশ বলিল—'আমরা যে কালে বাস করছি সেটাই যে কল্পনার অতীত। আমরা বেঁচে থেকে ভারতের স্বাধীনতা দেখে যাব এ কি কেউ কল্পনা করেছিল? কিন্তু ও কথা যাক। আপনি প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু একেবারে মুক্তি পাবেন না। কিছু দণ্ড আপনাকে ভোগ করতে হবে। এ সংসারে কর্মফল একেবারে এড়ানো যায় না।'

প্রভাত বলিল—'কি দণ্ড বলুন, আপনি যে দণ্ড দেবেন আমি মাথা পেতে নেব।'

ব্যোমকেশ বলিল—'আপনাকে নিজের পরিচয় জানতে হবে।'

প্রভাত চক্ষু বিস্ফারিত করিল—'নিজের পরিচয়!'

'হ্যাঁ। নিজের পরিচয় আপনি জানেন কি?—পিতৃনাম?'

প্রভাত মাথা নাড়িয়া বলিল—'না। মা'র কাছে শুনেছি হাসপাতালে আমার জন্ম হয়েছিল। আর কিছু জানি না।'

'আমি জানি। আপনার পিতৃনাম—অনাদি হালদার।'

প্রভাতের উপর এই সংবাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা

করিব না, কারণ আমি নিজেই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। অবশেষে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম—'ব্যোমকেশ। এ কী বলছ তুমি। এর কোনও প্রমাণ আছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল—'আছে বৈকি। প্রভাতবাবুর গায়েই প্রমাণ আছে।'

'গায়ে !'

'হ্যাঁ। প্রভাতবাবুর কোমরে একটা আধুলির মত লাল জড়ুল আছে। প্রভাতবাবু, জড়ুলটা দেখতে পারি কি ?'

যন্ত্রের মত প্রভাত কামিজ তুলিল। ডান দিকে কাপড়ের কশির কাছে জড়ুল দেখা গেল। ব্যোমকেশ আমাকে বলিল—'ঠিক এইরকম জড়ুল আর কোথায় দেখেছ মনে আছে বোধহয়।'

মনে ছিল। মৃত অনাদি হালদারের কোমরে চাবি পরাইবার সময় ব্যোমকেশ দেখাইয়াছিল। কিন্তু বিস্ময় ঘুচিল না, অভিভূতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে প্রভাতবাবুর কোমরে জড়ুল আছে ?'

'প্রভাতবাবুকে যেদিন ডাক্তার তালুকদারের কাছে নিয়ে যাই সেদিন ডাক্তারকে ওঁর কোমরটা দেখতে বলেছিলাম।'

তবু মন দ্বিধাক্রান্ত হইয়া রহিল। বলিলাম, 'কিন্তু—একে কি প্রমাণ বলা চলে ?'

ব্যোমকেশ বলিল—'প্রমাণ না বলতে চাও বোলো না, কিন্তু যুক্তি সঙ্গত অনুমান—Legitimate inference বলতেই হবে। অনাদি হালদার খামকা পাটনায় গিয়েছিল কেন ? দপ্তরীর সহকারীকে পুষ্যিপুত্তুর নিতে গেল কেন ? প্রভাতবাবুকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দেবার কি দরকার ছিল। সব মিলিয়ে দ্যাখো, সন্দেহ থাকবে না।'

প্রভাত টলিতে টলিতে গিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম—সমস্তই ঠিক-ঠিক মিলিয়া যাইতেছে বটে। অনাদি হালদার জানিত প্রভাত তাহার ছেলে, ননীবালা তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। কালা বাজারে অনেক টাকা রোজগার করিয়া সে গোপনে ছেলেকে দেখিতে গিয়াছিল। যখন দেখিল ছেলে দপ্তরীর কাজ করে তখনই হয়তো নোটগুলোকে বই বাঁধাইয়া রাখিবার আইডিয়া তাহার মাথায় আসে। ছেলেকে ছেলে বলিয়া স্বীকার করার চেয়ে পোষ্যপুত্র নেওয়াই অনাদি হালদারের কুটিল বুদ্ধিতে বেশী সমীচীন মনে হইয়াছিল।...তাহার দুরন্ত প্রবৃত্তি মাঝখানে পড়িয়া সমস্ত ছারখার না করিয়া দিলে প্রভাতের জন্মরহস্য হয়তো চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।—

প্রভাত মড়ার মত মুখ তুলিয়া উঠিয়া বসিল, ভগ্নস্বরে বলিল—'ব্যোমকেশবাবু, এর চেয়ে আমার ফাঁসি দিলেন না কেন? রক্তের এ কলঙ্কের চেয়ে সে যে ঢের ভাল ছিল।'

ব্যোমকেশ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—'সাহস আনুন প্রভাতবাবু। রক্তের কলঙ্ক কার নেই? ভুলে যাবেন না যে মানুষ জাতটার দেহে পশুর রক্ত রয়েছে। মানুষ দীর্ঘ তপস্যার ফলে তার রক্তের বাঁদরামি কতকটা কাটিয়ে উঠেছে; সভ্য হয়েছে, ভদ্র হয়েছে—মানুষ হয়েছে। চেষ্টা করলে রক্তের প্রভাব জয় করা অসাধ্য কাজ নয়। অতীত ভুলে যান, অতীতের বন্ধন ছিঁড়ে গেছে। আজ নতুন ভারতবর্ষের নতুন মানুষ আপনি—অন্তরে বাহিরে আপনি স্বাধীন।'

প্রভাত অন্ধভাবে হাত বাড়াইয়া ব্যোমকেশের পদস্পর্শ করিল—'আশীর্বাদ করুন।'

সমাপ্ত

অন্যান্য গোয়েন্দা উপন্যাস

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মরণের রণ-ভেরী	২৲
শত্রু-সমরে নারী	২৲
কুহকিনীর ফাঁদ	২৲
গিরিচূড়ার বন্দী	২৲
নিশাচর বাজ	৪॥০
প্রচ্ছন্ন আততায়ী	২৲
চীনের ড্রাগন	৩৲
বিচারক দস্যু	২৲
লণ্ডনের নরক	২॥০
চক্রান্তজালে নারী	২৲

পাঁচকড়ি দে প্রণীত

হত্যাকারী কে ?	১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা-৬